আলোচনা।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

প্রণীত।

চুঁচুড়া।

সাধারণী যন্ত্রে শ্রীনন্দলাল বসু কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮২।

মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

সূচিপত্র।

———

আলোচনা।

পশুবৃত্তি।

প্রাচীন যুনানী লেখক ষ্ট্রাবো স্বরচিত ভূগোল গ্রন্থের ভারতবর্ষ খণ্ডে, লিখিয়াছেন যে সেকেন্দরের সমভিব্যাহারী ইতিহাসবেত্তারা বলেন,যে ভারতবর্ষের জঙ্গলে অনেক বানর আছে। এবং বানরেরা অনুকরণশীল, তাহাতেই অতি সহজে ধৃত হইয়া থাকে। শিকারীরা যখন দেখে যে কোন বৃক্ষে একটী বানর আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, তখন, তাহারা সেই বৃক্ষের তলদেশে একপাত্র জল রাখিয়া সেই জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন ও চক্ষু কপোলাদি মার্জ্জনা করে; পরে সেই জলপাত্র উঠাইয়া লইয়া সেইরূপ এক পাত্র আঠা রাখিয়া যায়। বানর অবতরণ করিয়া, সেই পাত্রস্থ আঠা দিয়া চক্ষু

মার্জ্জনাদি করে, নিমীলিত চক্ষু আর খুলিতে পারে না এবং অতি সহজে ধৃত হইয়া থাকে। কখন বা বৃক্ষ হইতে শিকারীরা বানরদলের সম্মুখ দিয়া দুই দুইটা থলে ইজেরের মত করিয়া পায়ে দিয়া চলিয়া যায়। পরে, সেইরূপ থলে, ভিতর দিকে তুলা ভরা এবং আঠা মাখান, মধ্যে মধ্যে রাখিয়া যায়, বানরেরা নামিয়া সেইগুলি সেই ভাবে পরিধান করে এবং অচিরাৎ চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া, ধৃত হয়।

বানরে মনুষ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া বিপদে পতিত হয়, শুনিলে, মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিজীবী জীব বানরকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। অথচ যখন মনুষ্যে মনুষ্যানুকরণ করিয়া সমূহ ক্ষতি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহারা তাহা দেখিয়াও দেখে না, বরং সময়ে সময়ে সেই অনুকরণ-ফলকে সভ্যতা নামে অভিহিত করিয়া সজাতির গৌরব করিয়া থাকে। হয়, মনুষ্য নিতান্ত নির্ব্বোধ জীব, নতুবা সজাতির একান্ত পক্ষপাতী; নহিলে আপন দোষ দর্শনে এরূপ অন্ধ কেন? ফলত মনুষ্য অনুকরণ-শীলতায় বানরাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে। বালকে বৃদ্ধের অনুকরণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধও

সময় পাইলে বালকের অনুকরণ করিতে বিরত হন না। যুবতী স্বামীর অনুকরণ করেন, স্বামী তাহার প্রতিশোধ দেন। অসভ্যে সভ্যলোকের অনুকরণ করিয়া থাকে, সভ্যলোকেও অসভ্যের অনুকরণ করিতে ক্ষান্ত নহেন। যে শিক্ষার, উচ্চ, নীচ, উচ্চাত্যুচ্চ, নীচান্নীচ, প্রভৃতি প্রভেদ লইয়া নিত্য এত গণ্ডগোল হইয়া থাকে, তাহা কি? অনুকরণ। যে বিদ্যার এত গৌরব কর, তাহা কি? তাহাও প্রধানত অনুকরণ। বঙ্গদেশে যে সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, বলিয়া জনরব নিত্য নিত্য শুনিতে পাও, তাহা কি? অনুকরণ। তানসেনের অনুকরণ মানসেন করিয়াছেন, মানসেনের অনুকরণ লয়সেন করিয়াছেন, লয়সেনের অনুকরণ সঙ্গতসেন করিয়াছেন, ক্রমে মিশ্র, আচার্য্য, গোস্বামী তাহাই করিতেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি,যে এ রাগিণীটিকে বিশুদ্ধা বা জঙ্গলা কেন বল? উত্তর পাইবে যে এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ বহুকাল ক্রমাগত অনুকরণ। ইতিহাসে দেখ, পুরুষানুক্রমে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছে, যে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব সাতশত তিপ্পান্ন অব্দে রোমুলস্ রোমক নগর সংস্থাপন করেন।

ছাত্রকে বা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যে এ কথা কেন বিশ্বাস করিব ? ছাত্র উত্তর দিবে,যে এই রূপ গ্রন্থে লেখা আছে; অর্থাৎ একজন যাহা বলিয়াছে, ছাত্র তাহার অনুকরণ করে মাত্র। পণ্ডিতে উত্তর দিবেন, যে, লিবি বা পলিবিয়স, জনশ্রুতিতে শুনিয়া এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহাও অনুকরণ। যে দেশাচারের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকে খড়্গহস্ত হইয়া, বলিয়াছেন, "ধন্য রে দেশাচার! তুই শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস" ইত্যাদি, সে সমস্তই অনুকরণের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। পিতৃ পিতামহের,প্রতিবেশী পরিজনের,বান্ধব বা স্বদেশীয়ের—অনুকরণের নামই দেশাচার। দেশাচার তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বাস্তবিক বিবেচনা করিতে গেলে, ইহাই প্রতীয়মান হয়, যে বানরাদি কোন কোন পশু যেরূপ অনুকরণশীল, মনুষ্য অনুকরণ ক্ষমতায়, বা স্পৃহায়, বা ফলে—তাহাদিগের অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তবে পশুদিগের অনুকরণ প্রবৃত্তি দর্শনে এত বিদ্রূপ কেন ?

বলিবেন, যে বানরাদি অনুকরণ স্পৃহা বশত অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আমরা বলি, যে মনুষ্য মনুষ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানাহারে, বেশভূষায়, এখন সকল কার্য্যেই বাঙ্গালি সাহেবদিগের অনুকরণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তবে কি না, বানরের অনুকরণের নাম নির্ব্বুদ্ধিতা, আমাদিগের অনুকরণের নাম সভ্যতা।

সভ্যতাভিমানী ভ্রাতৃবৃন্দ, এখন পায়জামা-পরিহিত বানরের ধরা পড়ার কথা শুনিলেন, বলুন দেখি, এই নিদাঘকালের মধ্যাহ্নে, দোহারা পাজামা, চারিপুরু গাজামা, গালিস মেখলা, ও শ্যামলা ধবলা, ধারণ করিয়া, নাগপাশ জড়িত জবড়জং সাজিয়া যখন স্ববৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন, তখন শিকারীর প্রতারণায় যেন ধরা পড়িয়াছেন, এইরূপ মনে হয় কি না? যদি বানরত্বে বংশজভাব প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে সময়ে সময়ে অবশ্যই এইরূপ পরিচ্ছদ আমাদের দেশের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হইবে। তাহা যে কেবল অনুকরণমূলক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না এবং অনুকরণ এইরূপস্থলে যে একরূপ পশুবৃত্তি মাত্র তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিবে না।

সেইরূপ ইংরেজগণের পানাহারের, আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহা এখন অনেকেই অনুভব করিতে পারিবেন। সে সকলই পশুবৃত্তি হইতে।

পশুবৃত্তির উদাহরণ প্রদানার্থ আর একটী গল্প বলিব। বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর অঞ্চলে, জঙ্গলে অনেক ভল্লুক আছে। ভল্লুকে মৌয়াফুল খাইতে বড় ভাল বাসে। পাহাড়িয়ারা মৌয়াফুলে বঁড়সী বিদ্ধ করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম সূতা সংলগ্ন করিয়া বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া রাখিয়া আইসে। ভল্লুক মৌয়াফুল খাইতে গেলেই তালুতে বঁড়সী বিদ্ধ হয়, একটু টান দিলে বঁড়সী তালুতে বেদনা প্রদান করে। ভল্লুক আর না টানিয়া, বন্ধনসূত্র যত্নে দুই হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকে, প্রভাতে ধৃত হয়। এই সকল কথা শুনিলে কে না হাস্য করিবেন; কিন্তু মনে করুন যে এইরূপ সামান্য সূত্র অনর্থক ধারণ করিয়া আমাদিগকে কত দিবস কত রাত্রি বসিয়া কাটাইতে হয়। শেষে চরমকালে, শমন ব্যাধ ধারণ করিলে চটকা ভাঙ্গিয়া যায়। তবে ভল্লুকের সূত্র ধারণের নাম

নির্ব্বুদ্ধিতা, আমাদের সূত্র ধারণের নাম মায়া বা মমতা। অনেক সময় অনেকে এই মমতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মধুফুল প্রয়াসী ঋক্ষের ন্যায় চিরকাল কাটাইয়া থাকে। সংসারে দেখিবেন মধুফুলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই মায়াসূত্র বাঁধা থাকে। সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমরা অক্লেশে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে একটু তালুতে বেদনা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেই ভয়ে, চির-কাল সন্তর্পণে সূত্র সেবায় নিযুক্ত থাকি।

আজি পনের যোল বৎসর হইল বিলাতীয় পত্র সাটর্ডেরিবিউতে Tame Cat বা পোষা বিড়াল ইত্যভিধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ লেখক বিলাতে বড় বড় লর্ডের বাটীতে যেসকল বেতনভোগী বাস্তু পুরোহিত থাকেন তাঁহাদিগকে পোষা বিড়ালের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। আমরা ও আমাদের দেশে এরূপ পোষা-বিড়াল-বৃত্তিভাবাপন্ন লোক বিস্তর দেখিতে পাই। কাঠের বিড়ালেও কখন কখন ইন্দুর ধরিতে পারে; কিন্তু পোষা বিড়াল কখনই ইন্দুর ধরে না। অথচ আবদার কত? তোমার দৌহিত্র, পৌত্র যত না

আবদার করে, পোষা বিড়াল তাহা অপেক্ষা অধিক আবদার করিয়া থাকে। তুমি সুক্তানি শেষ করিয়া মাছের ঝোলের বাটীতে হাত দিয়াছ মাত্র, অমনি পোষা বিড়াল, ঊর্দ্ধোত্থিত লাঙ্গুল ঈষৎ কম্পিত করিয়া তোমার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ম্যাও।" তোমার পার্শ্বে মানুষ বিড়ালও ঠিক্ সেইরূপ করিবে, কেবল বিড়ালের ভাষায় ম্যাও না বলিয়া, মানুষবিড়ালের ভাষায় বলিবে "দাও।" এই দুই বিড়ালকেই এড়াইবার উপায় নাই। ভুক্তাবশিষ্ট কণ্টকই হউক বা মধুসংশ্লিষ্ট মাংস খণ্ডই হউক, কিছু না কিছু ইহাদিগকে দিতেই হইবে।

এমন সময় বিশেষে হইয়া থাকে, যে, বিড়াল ছেলেদের পাত হইতে ভাজা মাছ মুখে করিয়া লইয়া গেল, দেখিয়া, গৃহিণী মহাবিরক্ত হইয়া বিড়ালকে তাড়না করিলেন, বিড়াল প্রহারিত হইল; কিন্তু কখন শুনিয়াছ যে বিড়াল প্রহারিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। বিড়াল অপমান বোধ করিতে পারে, বিড়ালের ভয় আছে, কিন্তু বিড়ালের সকল বৃত্তি অপেক্ষা লোভ বিশেষ প্রবল;

বিড়াল লোভ কখন ছাড়িতে পারে না। যতদিন তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে, ছায়ার মাঝে রৌদ্র, রৌদ্রের মাঝে ছায়া থাকিবে, ততদিন বিড়াল সেই রৌদ্রে, সেই ছায়ায়, অকাতরে নিদ্রা যাইবে। যতদিন তোমার অন্ন থালের পার্শ্বে ঝোলেরবাটী, পায়সের বাটী প্রভৃতি সপ্তসাগরের মত শোভা করিবে তত দিন বিড়াল তোমার আহারের পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবে। তোমার অন্নে হৃষ্টপুষ্ট হইবে; কোথায় যাইবেও না, গৃহেও ইন্দুর ধরিবে না।

এইরূপ নানাবিধ পশুবৃত্তি, মানবকার্য্যে সর্ব্ব দাই দেখিতে পাওয়া যায়! তবে পশুর পশুবৃত্তি মানবের কাছে উপহসনীয়া, অথচ মানবের পশু-বৃত্তি সেই মানবের কাছে শ্লাঘনীয়া। কেন না মানব বুদ্ধিজীবী হইয়াও, নিতান্ত মোহান্ধ এবং সজাতির একান্ত পক্ষপাতী।

বাণিজ্যে পর-প্রত্যাশা।

বাণিজ্যে পর-প্রত্যাশী হওয়া কি বড়ই অমঙ্গলের কথা? এই প্রশ্নে আমাদের দেশীয় অনেকেই উত্তর দিবেন, যে, যখন কোন বিষয়ে কাহারও মুখ চাহিয়া থাকাই মন্দ, তখন বাণিজ্যে পর-মুখ-প্রত্যাশী হওয়া ভাল নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এ বিষয়টি একটু নিগূঢ়ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

সামান্য ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যেই বলুন, তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন সমাজেই বলুন, আর এই সমগ্র মনুষ্যজাতি মধ্যেই বলুন, পর প্রত্যাশাই সামাজিক বন্ধনী, পরপ্রত্যাশাই সভ্যতার ভিত্তিভূমি, পর প্রত্যাশাই মনুষ্যত্বের পতাকা! স্বাতন্ত্র্য—পশুধর্ম্ম মাত্র, পরতন্ত্রতাই মানবধর্ম্মের মূল। পুরোহিত স্ত্রী পুরুষকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া যে দম্পতি নাম প্রদান করেন, সে কেবল উভয়কে উভয়ের প্রত্যাশী হইতে শিক্ষা দেওয়া মাত্র। শাস্ত্রকারেরা কোন এক সমাজকে শাসনরজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া, কোন এক বিশেষ নাম প্রদান করেন, তাহা কেবল সেই সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে পরস্পর প্রত্যাশী

হইতে বলা মাত্র। এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর প্রকৃতিই এই, যে, কেহ অন্যের সাহায্য ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতে পারে না, অতি সামান্য কার্য্যও করিতে পারে না, এবং কোন প্রকারেই আপন জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

এই পরপ্রত্যাশা না থাকিলে পৃথিবীতে বাণিজ্য শব্দই থাকিত না। পর-প্রত্যাশা পূরণের নামই বাণিজ্য। ইহা ভিন্ন বাণিজ্য আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হউক, এরূপ যিনি প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষবাসীরা দিন দিন অধিকতর পরপ্রত্যাশী হউক এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে দিন দিন ভারতবর্ষের অধিকতর মুখাপেক্ষী করুক।

এরূপ অনেকে তর্ক করিতে পারেন, যে ভাল পরপ্রত্যাশা পূরণই যদি বাণিজ্য হয়, হউক, ভারত-বর্ষবাসী ভিন্নদেশীয়দিগের প্রত্যাশা পূরণ করুক, সেইরূপে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বৃদ্ধি হউক, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীরা যেন কোন দ্রব্যের জন্য অন্য জাতির মুখাপেক্ষা করিয়া না থাকে। এই তর্ক ভ্রম-পরিপূর্ণ; কোন এক জাতি যদি কোন বিষয়ে

অপর এক জাতির মুখাপেক্ষী হয়, তাহা হইলে এই শেষোক্ত জাতিকেও কোন না কোন বিষয়ে ঐ প্রথমোক্ত জাতির প্রত্যাশী হইতে হইবে। আমেরিকায় গৃহবিবাদে, একবৎসর তুলা রপ্তানি বন্ধ থাকে; লাঙ্কেশায়েরে তুলার আমদানি না হওয়ায়, সেখানকার কাপড়ের কল সমস্ত বন্ধ হইয়া যায়; তাহাতে ভারতবর্ষে থানের আমদানি বন্ধ হওয়াতে এখানে বস্ত্র অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠে। অনেকে বলিবেন ভারতবর্ষ বস্ত্রের জন্য মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষী থাকাতেই এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে। আমরা বলি, ভারতবর্ষ যেরূপ মাঞ্চেষ্টরের মুখ চাহিয়া থাকে, মাঞ্চেষ্টরও ঠিক সেইরূপ ভারতবর্ষের মুখ চাহিয়া থাকে। যদি ভারতবর্ষে এরূপ কোন দৈবনিগ্রহ বা রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, যে, লোকে বিপদে ব্যস্ত হইয়া, বা রোগে শীর্ণ হইয়া বা অন্য কোন কারণে, কিছুকাল বস্ত্র ক্রয় করিতে না পারে, তাহা হইলে তখনই দেখিবেন, যে, যে মাঞ্চেষ্টরের প্রতি আমরা প্রতি সপ্তাহে সম্বাদপত্রে কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, সেই মাঞ্চেষ্টরের কি দুর্দ্দশা হয়। বস্ত্র বিক্রীত হইলে, তবে বিলাতীয় তন্তুজীবীরা

জীবিকা সঞ্চয় করিতে পারে; এক বৎসর কোন কারণে বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ থাকিলে, সেই তন্তুজীবিগণ মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমরা যেরূপ মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি, মাঞ্চেষ্টরও সেইরূপ আমাদের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে; আমরা বিলাতবাসীদিগের নিকট বস্ত্র প্রত্যাশা করিয়া থাকি, আমাদিগের নিকট তাঁহারা টাকা প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; উভয়েরই সমান প্রত্যাশা, কেহ কাহারও নিকট ভিক্ষা বা যাচ্ঞা করে না। কোন এক বস্তুর বিনিময়ে অপর বস্তুর প্রত্যাশা উভয় জাতিই করিয়া থাকে।

ইহার পর অনেকে বলিতে পারেন, যে, যদি ভিন্ন দেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য থাকিতে গেলেই তাহাদের প্রত্যাশী হইতে হয়, তা না হয় ভারত-বর্ষের বহির্বাণিজ্য নাই থাকিল। আমরা আপনারা আপনাদের আহারোপযোগী শস্যোৎপাদন করিব, বস্ত্র বয়ন করিব, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিব, কখন কোন সামগ্রী বা অর্থের জন্য কাহারও কিছু প্রত্যাশা করিব না। ইহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে বিস্তর ক্ষতি আছে; এইরূপ স্বাবলম্বী,

স্বতঃ-সন্তুষ্ট, স্বতঃ-পর্য্যাপ্ত, হইতে গিয়াই ভারতবর্ষ একবার উচ্ছিন্ন গিয়াছে।

যদি উন্নতি কামনা করিতে হয়, তবে প্রথমে অভাবের প্রার্থনা করিতে হইবে। অভাব বোধ না হইলে উন্নতির ইচ্ছাই হয় না; এবং শরীরের সহজ অভাব কয়েকটী ব্যতীত, সকল অভাবের বোধই দুষ্প্রাপ্য বস্তুর প্রতি লোভ হইতে জন্মিয়া থাকে। কূপমণ্ডুক কখনই সরোবর সন্তরণের অভাব অনুভব করিতে পারে না। পর্ব্বত-গুহা-বাসী অসভ্য কখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নাই বলিয়া দুঃখ বোধ করিতে পারে না। যে দূরবীক্ষণ দেখিয়াছে, সেই দূরবীক্ষণ পাইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে ব্যক্তি বিলাতের কলের কারখানা দেখিয়াছে, সেই জানে বিলাতের কলে কত উপকার হয়, সেই বিলাতের কল দেশে আনিতে ইচ্ছা করিবে। বিলাতের কল, বিলাতের ঘড়ি, বিলাতের বন্দুক, ভিন্ন দেশের বাদ্যযন্ত্র, চিত্রপট, ঝাড় লণ্ঠন, ঊর্ণা, আল্পাকা প্রভৃতি যে প্রয়োজনীয় পদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি এ সকলের কামনা করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গেই পরপ্রত্যাশী হইতে হইবে। আর

যদি বলেন, যে এ সকলে প্রয়োজন কি ? তাহা হইলে ত কথা নাই। যাঁহার ভোগাভিলাষ নাই, তাঁহার জন্য আমরা এ কর্ম্মভোগ করিতেছি না। তিনি ঐহিক উন্নতি প্রয়াসী নহেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাণিজ্যই বা কি, আর ভারতবর্ষই বা কি ? এরূপ উপরত-স্পৃহ ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত সংসার নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে, বাণিজ্য প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু অর্থের জন্য ভিন্ন জাতির মুখাপেক্ষা করিতে হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর জন্য যেন কাহারও মুখ চাহিয়া না থাকিতে হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি বেশী হউক, ভারতবর্ষে আমদানি না থাকে ক্ষতি কি ?

এরূপ তর্কে দুইটী দোষ আছে, প্রথমত, এরূপ কখন হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, হইলেও ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। মনে করুন, ভারতবর্ষ সম্বৎসরে দশকোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি করিয়া, সেই পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন ; যদি সেই টাকায় ভিন্নদেশ হইতে দ্রব্যজাত আমদানি না করেন, তাহা হইলে, এই দশকোটি টাকা কি হইবে ? অনেকে উত্তর দিবেন, যে সেই টাকায় ভারতবর্ষের দীন দুঃখী

দিগের ভরণপোষণ হইবে। ভরণপোষণ হইয়া যাহা উদ্বর্ত্ত ছিল, তাহাই ত রপ্তানি করা হইয়াছিল, তবে আবার তাহারা প্রতিপালিত হইবে কিরূপে? যদি বলেন, যে তাহারা সঞ্চয় করিবে। যে সঞ্চিত ধন হইতে কস্মিন্‌কালে ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই, সে সঞ্চয় লাভ নহে, ক্ষতি মাত্র। যদি বলেন দরিদ্র, নিতান্ত আবশ্যকীয় পদার্থ ছাড়া জুতা ছাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবে, তাহা হইলে সেই পর-মুখাপেক্ষা আবার সমাজে প্রবেশ লাভ করিল। সুতরাং শুদ্ধ রপ্তানি বা অর্থলাভই বাণিজ্যে প্রার্থনীয় নহে, আমদানি বা ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যসামগ্রীও সমভাবে প্রার্থনীয়।

তবে এই এক কথা হইতে পারে, যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভিন্ন জাতির মুখাপেক্ষী হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই কথা সকল দেশে খাটে না; তাহা হইলে অনুর্ব্বর প্রদেশে মনুষ্য বাস অসম্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষকে গ্রাসাচ্ছাদনের বস্তুর জন্য অন্য কোন জাতির প্রত্যাশী হওয়া ভাল দেখায় না। সুতরাং ভারতবর্ষে 'বাণিজ্যে পরপ্রত্যাশা', কতকদূর চাই;

যে পরিমাণে আছে এত না থাকিলেই ভাল হয়।

অতএব বাণিজ্যে পরপ্রত্যাশা প্রার্থনীয়। যে পরপ্রত্যাশী, অন্যে তাহার প্রত্যাশা। ভারতবর্ষ কি কি বস্তুর জন্য কতদূর অন্য দেশের উপর প্রত্যাশা রাখে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশই বা ভারতবর্ষের উপর কতদূর প্রত্যাশা স্থাপন করে, এখন তাহাই দেখা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য-সাম্য আছে কি, না? অর্থাৎ আমাদের যত আয় তত ব্যয়? অথবা কিছু স্থিত থাকে, না ফাজিল যায়?

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য দেশভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ক। বিলাতের সহিত;

খ। চীনদেশের সহিত;

গ। এবং অন্যান্য দেশের সহিত।

আবার বিষয় ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। দ্রব্য সামগ্রীর আমদানি বা রপ্তানি,

২য়। অর্থাগম, নিগম ;

৩য়। ইংরেজকৃত উপকারের বিনিময় স্বরূপ ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটরিকে, বর্ষে বর্ষে যাহা দিতে হয়, অর্থাৎ রাজকর ;

৪। বিদেশে হুণ্ডীয়ান কারবার ;

৫। এবং বহনি বা চালানি খরচ অর্থাৎ জাহাজভাড়া।

(ক) বিলাতে আমরা তুলা, রেশম, নীল, তিসী, শণ, পাট প্রভৃতি স্বভাবজ দ্রব্য রপ্তানি করি, বিনিময়ে বিলাতের শিল্পজাত পাইয়া থাকি। প্রথম দ্বিতীয় বিষয়ে বিলাতের সহিত প্রধান সম্পর্ক এই। ৩য়টি, অবশ্য সম্পূর্ণ বিলাতের এক চেটে। ৪র্থ ত, বিলাতের সহিত হুণ্ডীয়ান কারবার বিস্তর। ৫ম, জাহাজ ভাড়া বিলাতীয়েরাই প্রায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, মার্কিন জাহাজ, ফরাসী জাহাজ, গ্রীক জাহাজের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমানদিগের জাহাজ নাই। পারসীদের আছে, নাম মাত্র। সুতরাং জাহাজ ভাড়াটা ভারতবাণিজ্যের হিসাবে খরচের অঙ্কেই পড়ে, জমার অঙ্কে পড়ে না।

(খ) চীনের সহিত প্রধানত আমাদের কি সম্পর্ক তাহা সকলেই জানেন। চীনীয়দিগকে আমরা বার্ষিক আট কোটি টাকার অহিফেণ প্রদান করিয়া থাকি। তাহার বদলে কতক মুদ্রা পাই, কতক স্বর্ণ পাই, আর কতক টাকা বিলাতের উপর হুণ্ডী-স্বরূপে পাইয়া থাকি। চীনেরা বিলাতে যে সকল দ্রব্য পাঠান, তাহার মূল্য সমুদায় না লইয়া বিলাতীয় মহাজনগণের নামে অহিফেণের কিয়দংশ মূল্যের জন্য হুণ্ডী দেন। সুতরাং চীনীয়দিগের সহিত আমাদের হুণ্ডীয়ান কারবার বিলক্ষণ আছে।

দেশের নাম।	আমদানি কি রপ্তানি।	দ্রব্য।	কত টাকা।
ফ্রান্স	হইতে	রোক	১৯৪৮৪৭০
	আমদানি	মাল	১৭৯২৮০
ফ্রান্সে	রপ্তানি	তুলা	১৬৭৬৯৪৫০
		বীজ	৯৪৯৫৪৫০
মরীচীদ্বীপে	রপ্তানি	তণ্ডুল	৩৩৪৫৫৫০
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ-পুঞ্জে	ঐ	ঐ	৫৮০৪৯০
লঙ্কাদ্বীপে	ঐ	ঐ	১৬৪৪৯৫০
অষ্ট্রেলিয়া	হইতে আমদানি	তাম্র	১১২২৮৬০
		সোণা	ঐরূপ

(গ) অন্যান্য দেশের সহিত কিরূপ কত বাণিজ্য তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। অন্যান্য দেশে তুলা, বীজ, ও তণ্ডুলাদি রপ্তানি করি; ফ্রান্স হইতে মদ ও ফরাসী ছিটের কাপড় প্রভৃতি পাই, অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাম্র ও স্বর্ণ পাইয়া থাকি।

কিরূপ বাণিজ্য কোন দেশের সহিত হইয়া থাকে তাহা প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে, যে, পাঁচ ভাগে বাণিজ্যের বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা কি পরিমাণে হইয়া থাকে তাহা দেখান যাইতেছে। ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানির একায়ত্তে ছিল; প্রত্যেক দ্রব্য সামগ্রীতেই তাঁহারা অধিক শুল্ক গ্রহণ করিতেন; ঐ সালে ঐ প্রথা উঠিয়া যায়,এবং ভারতবর্ষে স্বাধীন বাণিজ্য প্রচলিত হয়। সুতরাং পণ্যের পরিমাণ করিতে হইলে ঐ সাল হইতে গণনা করিতে হয়। ১৮৩৫।৩৬ সাল হইতে ১৮৭০।৭১ সাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণে বাণিজ্য হইয়াছে, তাহা লইয়াই আমরা গণনা করিব।

(১) ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৭০।৭১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ১০১২ কোটী টাকার দ্রব্যজাত

রপ্তানি হইয়াছে এবং সেই সময় মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫৮৩ কোটি টাকার দ্রব্যজাত আমদানি হইয়াছে। (২) কিন্তু ঐ কয়েক বৎসরে অর্থবাণিজ্যে আমরা ৩৭ কোটি টাকা, ভিন্নদেশে পাঠাইয়াছি মাত্র অথচ ভিন্ন দেশ হইতে ৩১২ কোটি টাকার মুদ্রা ভারতবর্ষে আসিয়াছে। সুতরাং মোট রপ্তানি হইল ১০৪৯ কোটি, মোট আমদানি হইল ৮৯৫ কোটি ; বাকি রহিল ১৫৪। কেবল প্রথম দুইটি বিষয় ধরিতে গেলে ১৫৪ কোটি টাকা ভারতবর্ষের জমার অঙ্কে থাকে।

(৩) তাহার পর দেখিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট-সেক্রেটরিকে আমাদের কত দিতে হইয়াছে। ষ্টেট-সেক্রেটরির সহিত হিসাবে, জমা কিছুই হয় না, শুধুই খরচ। সেক্রেটরি অব ষ্টেটকে কি কি জন্য আমাদের অর্থ প্রেরণ করিতে হয়, তাহাও বলা যাইতেছে ;

(/০) সিবিল ও মিলিটরি কর্ম্মচারিগণের পেনশন বৃত্তি এবং ফর্লো বৃত্তি।

(৵০) বিলাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌন্সিল

বা যে কিছু কার্য্যালয় আছে, তাহার কর্ম্মচারিগণের বেতন ও সরঞ্জমি খরচ ভারতবর্ষ হইতে দিতে হয়।

(৶০) ভারতবর্ষের বেতনভোগী কতকগুলি সৈন্য বিলাতে আছে; কেননা রাজ্যরক্ষার্থ অগ্রে রাজশ্রীর রক্ষা আবশ্যক।

(।০) এতদ্ব্যতীত, কখন তুরস্কের সুলতান গেলেন, তাঁহাকে খানা দেওয়া আবশ্যক হইল, বা পারস্যের শাহেন-শাহ বিলাতে পদার্পণ করিলেন, তাঁহাকে কিছু নজর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল, অথবা ভারতবর্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ দুষ্ট আবিসিনিয়া পতিকে দমন করা কর্ত্তব্য বোধ হইল, এইরূপ কোন কারণে যে কিছুই ব্যয় হয়, তাহা অবশ্যই ভারতবর্ষকে দিতে হইবে।

পূর্ব্বে ১৮৩৫ সাল হইতে ৩৬ সাল পর্য্যন্ত এই খরচ এখনকার হিসাবে অল্প লাগিত বলিতে হইবে। ১ কোটি ২ কোটি কখন বা ৩ কোটি লাগিত। তাহার পর ৫৭।৫৮।৫৯।৬০ সালে অতি অল্প লাগিয়াছিল, ৬০।৬১ সালে ৮০০০ টাকা লাগিয়াছিল মাত্র। তাহার পর বৎসর এক

কোটির কিছু বেশী। তাহার পর এখন, কখন বা ৬ কোটি, কখন ৫, কখন ৪, কখন বা ৮ কোটি লাগিতেছে; ৭০।৭১ সালে ৮,৪৪,৩৫,০৯০ টাকা লাগিয়াছে। মোট ৩৫ সাল হইতে ৭১ সাল পর্য্যন্ত ১১৩ কোটি এইরূপে গিয়াছে।

সুতরাং আমরা যে ১৫৪ কোটি টাকা লাভের অঙ্কে রাখিতেছিলাম, তাহার মধ্যে বাদ গেল ১১৩ কোটি। বাকি রহিল ৪১ কোটি।

৪র্থ বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে ৫ম,দফার কথা বলিয়া দেওয়া যাইতেছে; বর্ষে বর্ষে জাহাজ ভাড়া কত লাগে তাহা স্থির জানা কাহারও নাই, তবে মান্যবর টেম্পল সাহেব বলেন, যে বহনী জন্য আন্দাজি ১ কোটি টাকা প্রতি বর্ষে বিলাতীয় মহাজনগণকে দিতে হয়; এটীও আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি; তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা বলিতে হয়, যে, বিলাতীয় মহাজনেরা সকলেই যে এখানে নিঃস্ব আসেন, এমত নহে, বিলাতের কতক টাকাও এদেশে খাটিতেছে; এই টাকার পরিমাণও টেম্পল মহোদয় অনুমান করেন, যে, প্রায় এক কোটী হইবে। সুতরাং এই দুইটী

আন্দাজি হিসাবের টাকা একই পরিমাণের হও-য়াতে জমা খরচ মিলিয়া গেল।

পূর্ব্বে যে ছত্রিশ বৎসরে ৪১ কোটী টাকা লাভ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

এই টাকা কি বাস্তবিক লাভ হইয়াছে? তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। অনেকে বলেন, যে, আমাদের দেশ ক্রমেই অর্থশূন্য হইতেছে; আবার অনেকে বলেন, যে, সে কথা মিথ্যা, দেশে অর্থাগমের নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে। তাহা হউক, আর নাই হউক,

(৪) আরও অনেক টাকা আমাদিগকে বিলাতে দিতে হয়। এগুলি রাজকীয় গণনায় নহে।

আজি কালি প্রতি বর্ষে কত লাগে তাহাই আমরা বলিতেছি;

(অ) বিলাতে ভারতবর্ষের জন্য যে ঋণ করা হয়, তাহার সুদ ৭৫ লক্ষ টাকা।

(আ) ভারতবর্ষে কোম্পানি কাগজের যে সুদ বিলাতের ধনীরা প্রাপ্ত হন, তাহা এককোটী ২৫ লক্ষ টাকা।

(ই) শেয়ারের মুনাফা, বাণিজ্যের লভ্য, ভূমির কর, বাটী ভাড়া প্রভৃতি যাহা বিলাতীয়েরা পান, তাহা ৭৫ লক্ষ টাকা।

(ঈ) বিলাতীয়েরা যাহা পরিবারবর্গকে প্রেরণ করেন, তাহাও ৭৫ লক্ষ টাকা সুতরাং প্রতি বর্ষে এইরূপে সাড়ে তিন কোটী টাকা বিলাতে যায়। কিন্তু এখন যত যাইতেছে পূর্ব্বে এত যাইত না।

যদি প্রতি বর্ষে এইরূপ সাড়ে তিন কোটী টাকা দিতে হইল, তাহা হইলে, যে, ৪১ কোটী টাকা আমরা লাভ মনে করিতেছিলাম, তাহা ছাপাইয়া গিয়া, অনেক টাকা আমাদিগকে ফাজিল লোকসান দিতে হইতেছে, বলিতে হইবে।

অতএব বুঝিতে পারা গেল, যে ভারতবর্ষে প্রকৃত বাণিজ্যসাম্য থাকুক, আর নাই থাকুক, পণ্য-বাণিজ্যে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু রাজনৈতিক বাণিজ্যে, অর্থাৎ ইংরেজরাজকৃত উপকারের বিনিময় অর্থদানে আমরা ক্রমেই অধিক-তর অর্থহীন হইতেছি। কিন্তু রাজনৈতিক কোন বিষয় এই পুস্তকের আলোচ্য নহে বলিয়া, সে বিষয়ে আমরা অন্য কোন কথা বলিলাম না।

ধর্ম্ম।

পরোপকারই ধর্ম্মের এক মাত্র সাধন, অপকারই ধর্ম্মের এক মাত্র অন্তরায়। যিনি উপকারী তিনিই ধার্ম্মিক, যিনি অপকারী তিনিই অধার্ম্মিক। আর উপকারেই সুখ, এবং অপকারেই সুখের হ্রাস। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত এই জগদ্বাসীর সুখ দুঃখের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সকলেরই আছে। ধর্ম্ম, আচার্য্য বা উপাচার্য্য, গুরু বা পুরোহিতের নিজস্ব নহে, ধর্ম্ম আমাদের সকলেরই। কিন্তু আজ কাল এমনই কাল পড়িয়াছে, যে তুমি আমি ধর্ম্মের কোন কথায় প্রায়ই থাকিতে চাহি না, কেন না উহাতে বড় গোল, বড় বিসম্বাদ, বড় কলহ হয়। এ সকল নিতান্ত অসার কথা। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই, বিসম্বাদ নাই।

স্বীয় বাটীর নিত্যসেবার ভার যেরূপ বৃদ্ধা পরিচারিকা ও পুরোহিতের প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ এই ধর্ম্মের ভার, তত্ত্ববোধিনী বা ধর্ম্মতত্ত্ব অথবা রবিবারের মিরারের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এইরূপ বিশ্বাসে, যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে তাহার নাম সমাজ। পরস্পরের সাহায্যও যাহাকে বলে, পরস্পরের উপকারও তাহাকেই বলে, সুতরাং পরস্পরের উপকারেচ্ছু সম্প্রদায়ের নামই সমাজ। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপকারই ধর্ম্মের সাধন; তাহাতেই বলি একমাত্র ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। এ হেন ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যদি বাস্তবিক দেশের উপকার করিতে, সমাজের উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

অনেকে উত্তর করিতে পারেন, যথার্থ ধর্ম্মে অর্থাৎ পরোপকারে কাহারও বিতৃষ্ণা নাই। মনুষ্য মাত্রেই উপচিকীর্ষু; তবে বুদ্ধির ভ্রমবশত রামের উপকার করিতে গিয়া শ্যামের মন্দ করিয়া বসে। মনুষ্যের বিবেচনাশক্তির পরিপুষ্টি হইলেই, মনুষ্য একের উপকারের সহিত অন্যের অপকারের তুলনা করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে কোন কার্য্যে এক জনের লাভ অপেক্ষা অপরের ক্ষতি অধিক

হইতেছে, তখন আর সে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। স্ত্রীর অলঙ্কারের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া একজনের সর্ব্বনাশ করিবে না। যে যত ভাল বিবেচনা করিতে পারিবে, সে ততই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। এরূপ জ্ঞান-ধর্ম্মে তাঁহাদের কাহারও বিদ্বেষ নাই; আরও বলিতে পারেন যে, এ ধর্ম্মের সহিত তিলক, ত্রিকণ্ঠীর, দাড়ী, চসমার, কি সম্বন্ধ আছে? তাঁহারা ধর্ম্মবিদ্বেষী নহেন, কিন্তু উপধর্ম্মে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা আছে।

এই দুই কথার সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। ধর্ম্ম এবং খণ্ডধর্ম্ম ইহার একটিকেও আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। প্রথম কথা, বুদ্ধিকে আমরা একা কর্ত্রী করিতে প্রস্তুত নহি। কেন না বুদ্ধির শাসন নাই, ধর্ম্মের শাসন আছে। অধর্ম্মে অসুখ, এ কথা ঘোর অধার্ম্মিককেও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, কখন নির্ব্বোধে স্বীকার করে না। বুদ্ধি ভাল মন্দ বুঝাইয়া দেয় বটে, কিন্তু মন্দ ছাড়িয়া ভালটি অনুসরণ করিতে হইবে, এ উপদেশ কেবল ধর্ম্মই

প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং আমরা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্থাপনার্থ আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে ধর্ম্মযাজনও যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এখন স্বীকার করিয়া থাকেন, যে ভারতবর্ষীয়গণের বর্ত্তমান অবস্থা অতি মন্দ। কিসে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে এ বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। কেহ দুটা মিষ্ট কথায় ভরসা দিয়া থাকেন, কেহ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া একেবারে আমাদিগকে হতাশ করিয়া তুলেন, স্থূলত পাঁচজনে পাঁচ কথা কহিয়া থাকেন, তাহাতে সার অসার দুইই থাকে।

কেহ বলেন, "যদি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সে অভিলাষের বল স্থায়ী হয়,তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।" তাহার পরে উন্নতি হইবে; অর্থাৎ উদ্যম,

একতা, সাহস,ও অধ্যবসায় হইলেই ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

আর একজন বলেন, ভারতবর্ষীয়কে ব্যায়াম শিক্ষা দেও, মদ্য মাংস খাইতে দেও, ভাল পরিচ্ছদ দেও, চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দেও, পরকাল চিন্তা হইতে বিরত কর, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

তৃতীয় আর একজন বলেন,অত কথার আবশ্যক কি? একতা হইলেই ভারতবর্ষীয়ের উন্নতি হইবে।

চতুর্থ ব্যক্তি বলেন, ধন হইলেই ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে। আমাদের দেশের টাকা দেশে থাকুক, দেশের কাপড় দেশে জন্মাক, দেশের ভূমি-সম্পত্তি দেশের লোকের হস্তেই থাকুক, দেশে কল কর, কজা কর, দেশের উন্নতি হইবে।

আর এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষা দেও, বিধবার বিবাহ দেও, জাতিভেদ উঠাইয়া দেও, বাল্যবিবাহ রহিত কর, ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে।

আমরা বলি, যদি ভারতে একবার ধর্ম্মের তরঙ্গ তুলিয়া তুফান করিতে পার, তবেই ভারতের মঙ্গল হইবে। উদ্যম বল, ঐক্য বল, সাহস বল,

অধ্যবসায় বল, এক ধর্ম্মে সকল মিলিবে। শুদ্ধ ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্যই এখন এমন উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হয় নাই, যে সাধারণ লোক "কেন এটি করিব?" "কেন এটি করিব না?" এইরূপ ভাবিয়া, চিন্তিয়া যথার্থ পথ অবলম্বন করিতে পারে। যতদিন 'কেনর' ধ্বংশ না হয় ততদিন সাধারণের উন্নতি নাই। 'কেনর' ধ্বংশ না হইলে একতা হয় না। তুমি বলিলে, এই কর্ম্ম কর, আমি বলিলাম, কেন করিব? তুমি বলিলে এই জন্য করিতে হইবে, আমি বলিলাম, তাহাতে এই দোষ; তুমিও বুদ্ধিমান্‌, আমিও বুদ্ধি-মান্‌, তোমায় আমায় যাবজ্জীবন তর্ক চলিতে লাগিল। মীমাংসাও হয় না একতাও হয় না। তাহাতেই বলি অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এই 'কেনর' ধ্বংশ না হইলে, আমাদের আর নিস্তার নাই। ধর্ম্ম বিপ্লবে এই 'কেনর' দমন কিছুকালের জন্য হইবে।

সকল রাজ্যের ইতিহাসেই দেখিবেন, যে সমাজের অত্যন্ত হীনাবস্থা হইলে, এক এক জন অমানুষ মানুষের আবির্ভাব হয়, তিনি এই কেনর

মস্তকে পদার্পণ করিয়া শঙ্করকে বলিতে থাকেন, ‘কর’ লোকে অমনি অবনত মস্তকে বলিয়া উঠে ‘করি ;’ এবং তিনি যাহাই বলেন, সকলে তাহাই করিতে থাকে। তখন তাহাদের উদ্যম হয়, ঐক্য হয়, সাহস হয়, অধ্যবসায় হয়। তখন তাহারা এক মুষ্টি চনক চর্ব্বন করিয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বিচিত্র পরিচ্ছদধারী, মদ্য-মাংসাহারী, সভ্য সৈনিক তাহার শতাংশের একাংশও করিতে কদাচ সাহসী হয় না।

আমরা সেইরূপ একজন অমানুষ লোক চাই, সেইরূপ একটি ধর্ম্ম বিপ্লব চাই। যেখানে যেমন গ্রহদোষ, সেখানে তেমনি স্বস্ত্যয়ন চাই। এই গ্রহ শান্তি সম্বাদপত্রে পারিবে না। এ দুর্দ্দৈব খণ্ডন সভা করিয়া বক্তৃতা করিলে হইবে না। রেলওয়ে টেলিগ্রাফের কর্ম্ম নয়, যে ভারত উদ্ধার করে। বোম্বায়ের তুলার কলের কর্ম্ম নয়, যে মৃত ভারতে জীবন দান করে। আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্ম নয়, যে টানাপাখার মন্দ হিল্লোলে ইমণ রাগিণীতে লোকের গাঢ় সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া দেয়। পুরোহিতের কর্ম্ম নয়, যে সহস্র গণ্ডকী-

শিলায় শতলক্ষ তুলসীপত্র স্থাপন করিয়া, এই গ্রহ শান্তি সাধন করেন। ইংরেজের কর্ম্ম নয়, যে আইন জালে বা কর জালে ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। ইঁহাদের কর্ম্ম নয়,—আমরা সোক্রাত বা শাক্যসিংহ, খ্রীষ্ট বা চৈতন্য চাই।

ধর্ম্মের তুফান না উঠিলে ভারতের মঙ্গল নাই; একটু পাগলামি দেশমধ্যে প্রবেশ না করিলে, এরূপ ঢিমে তেতালায় চলিলে যুগ যুগান্তেও ভারতের উন্নতি হইবে না। খণ্ড প্রলয়ে একদিক ভাঙ্গে; আর দিক গড়ে। আর অধিকাংশ যেমন তেমনই থাকে। যেটুকু ভাল করিবে, সেটুকু আবার গোমূত্র-স্পৃষ্ট দুগ্ধের ন্যায় অচিরাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।

একটি মহাপ্রলয় চাই। আব্রহ্ম-স্তম্ভ-পর্য্যন্ত ভারত একবার কাঁপিয়া উঠা চাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—একবার নাচিয়া উঠা চাই। কেবল একজনই এরূপ করিতে পারেন। একজন মহদ্ব্যক্তির মহদ্ঘোষই সকলের অন্তস্তল ভেদ করিতে পারে। যতদিন এরূপ একজন মহদ্ব্যক্তির আবির্ভাব না হয়,ততদিন ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে না।

যদি এই সকল কথা কিছু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তবে ধর্ম্মযাজনে বা ধর্ম্মকর্ম্মে অনাস্থা করা কথনই কর্ত্তব্য নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ধর্ম্ম এবং খণ্ডধর্ম্ম মানবচরিত্রে উভয়েরই সমান প্রয়োজন। হিন্দুয়ানী, খ্রীষ্টানী, মুসলমানী, এই সকলকে খণ্ডধর্ম্ম বলি; যেরূপ উপকার সাধন-ধর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; সেইরূপ বিভেদমূলক খণ্ডধর্ম্ম না থাকিলে জাতিত্ব থাকে না। এবং জাতিত্বই সমাজের মূল।

স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যগত ভাবের নাম খণ্ডধর্ম্ম। মানবহৃদয়ে দুইদিক হইতে দুইটি স্রোত চলিতেছে। একটি অপরটির বিপরীতাভি-মুখগামী। একটির নাম স্বার্থ, অপরটির নাম পরার্থ বা ধর্ম্ম। স্বার্থের অপর নাম 'অহংকার,' পরার্থের অপর নাম "উপকার।" 'অহংকার' আপনার জন্যই বিব্রত; 'উপকার' আপনার দিকে একবার পলকপাতও করেন না। 'স্বার্থ' কিসে কিঞ্চিৎ 'ভাল' হইবে, তাই লইয়া ব্যস্ত, এবং পাছে কিছু 'ক্ষতি' হইবে সেই ভয়েই সশঙ্কিত। 'ধর্ম্ম' আত্ম-

প্রসাদেই চরিতার্থ,এবং কেবল আত্ম-গ্লানিতে ভীত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আডাম স্মিথ মানবহৃদয়ের এই দুই বিভিন্ন ভাবের ফল পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তৎকৃত অর্থ ব্যবহার (Wealth of Nations) গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় যে ইহ সংসারের মধ্যে লাভালাভই মূল কথা। দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রবৃত্তিনিচয় নাটক বা উপন্যাসের কথা মাত্র। আবার সেইরূপ তৎকৃত 'ধর্ম্মভাব' Moral Sentiments) গ্রন্থে, মানবহৃদয়ের দেবভাব গুলি সেইরূপ জাজ্বল্যীকৃত রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক মানব, একাদিক্রমে কখন বিশুদ্ধ দেবভাব বা নিরবচ্ছিন্ন পশুভাব ভরে সংসারে জীবনক্ষেপ করেন না। দেবত্বে এবং পশুত্বে, মনুষ্যত্ব। মনুষ্য যখন কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, আবার কখন আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য উন্মত্ত।

ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ; স্বার্থের ক্রিয়া আকুঞ্চন। যে মনুষ্যে স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল, সে ক্রমে কুঞ্চিত, অতি কুঞ্চিত, অত্যতি কুঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে। শিক্ষার, এবং ভূয়োদর্শনের অভাবই এই ক্রমশ স্বার্থপ্রবলতার

হেতু। কতকগুলি লোক দিনের দিন এই অত্যতি কুঞ্চিত ভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। এমনই স্বার্থপর হইতেছেন, যে আজি কালি তাঁহারা আর তাঁহাদের অতিধন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্যও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিতে ইচ্ছুক নহেন। আত্ম-সেবায় তাঁহাদের চিত্তপ্রবৃত্তি পর্য্যাপ্ত থাকে। তাঁহারা ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। তাঁহাদের হৃদয় পরমাণু।

সেইরূপ আবার ধর্ম্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল,সে হৃদয় আর সমাজবন্ধন মানে না, জাতিভেদ মানে না। এরূপ ধর্ম্ম-প্রবল-মানব—সংসারত্যাগী। তাঁহার পক্ষে হিন্দু মুসল-মান নাই, স্নেহ নাই, প্রীতি নাই, বাৎসল্য নাই, শ্রদ্ধা নাই,প্রণয় নাই; কেবল আছে এক উপকার। এরূপ মানব সংসারে অতি বিরল। ইঁহাদের হৃদয় অ্যতি-সম্প্রসারিত; এরূপ সম্প্রসারিত, যে, সে হৃদয়ের গভীরতা একেবারে নাই বলিলেও চলে। সর্ব্ব মত্যন্তং গর্হিন্তং। অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবলতাও কিছু নহে, অত্যন্ত স্বার্থ-প্রবণতাও কিছু নহে। ঘোর স্বার্থানুসন্ধায়ী হইতে যেরূপ সমাজের কোন উপ-কার নাই, সেইরূপ কঠোর যোগী হইতে সমাজের

বা দেশের কোনই উপকার নাই। সুতরাং ধর্ম্ম এবং স্বার্থের সমঞ্জসীকরণ সমাজ রক্ষাপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মের প্রসারণক্রিয়া, এবং স্বার্থের আকুঞ্চন ক্রিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাতে সমমাণ (Equilibrium) রক্ষা হয়, সমাজ রক্ষার্থ এরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক। নহিলে ধর্ম্মের গুণে হয় ত ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে বাড়িতে থাকে, আর না হয় ত স্বার্থবলে, ক্রমেই কমিতে কমিতে কমিতে থাকে। ঐ উভয় শক্তি যদ্দ্বারা সমান বল সঞ্চয় করিয়া, উভয়ে মিলিয়া স্থিতি-স্থাপকতা লাভ করে, সমাজ রক্ষার্থ তাহা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব সমাজ রক্ষার্থ খণ্ডধর্ম্ম নিতান্ত আবশ্যক, কেন না খণ্ডধর্ম্ম দ্বারাই স্বার্থ এবং পরমার্থের সমঞ্জসীকরণ হয়।

খণ্ডধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, যে, তুমি কামস্কাট্‌কা দেশবাসী শীত সন্তানকে এবং এই পুণ্যভূমিবাসী ভারতের আর্য্যসন্তানকে এক চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিও না। বিদেশী-বিধর্ম্মীর সহিত তোমার স্বার্থসম্বন্ধ নাই। তোমার সহিত এক তাড়িতে তাহার হৃদয় তাড়িত হয় না। সে তোমার সহিত একভাষী

নহে; মহদ্বীজমন্ত্র ঘোষণা করিলে, তোমার মনে যেরূপ ভক্তির আবির্ভাব হইবে,তাহার মনে সেরূপ হইবে না; ভারতীয় তীর্থস্থান পর্য্যটন করিলে তোমার যেরূপ অপরূপ আনন্দ হইবে, তাহার সেরূপ হইবে না। অতএব হৃদয় কুঞ্চিত কর; তাহাকে পর জ্ঞান কর, বিধর্ম্মী বোধ কর; স্বধর্ম্মে পক্ষপাতী হও। এইরূপ উপদেশ হিন্দুধর্ম্ম প্রদান করে; এইরূপ উপদেশ পালন করা সকলেরই আবশ্যক। এই উপদেশ পালন করিলে, ধর্ম্মরক্ষা হয়, সমাজ রক্ষা হয়, দেশ রক্ষা হয়, স্বার্থ রক্ষা হয়, পরার্থ রক্ষা হয়, হৃদয় হয়, একতা হয়। জীবন্ত খণ্ডধর্ম্ম হৃদয়মধ্যে থাকিলে সকলই হয়।

মাংসাহার।

এতদিন অনেকরই ধারণা ছিল, যে শাকান্ন ভোজন অপেক্ষা মাংসাহারে অধিকতর বলাধান হয়। এই সংস্কারটি কতকটা ইংরেজি গ্রন্থাদি পাঠে, কতকটা ইংরেজের শারীরিক বলবীর্য্য দর্শনে এবং খানিকটা পোলাও কালিয়ার লোভে হইয়াছিল। এতকাল পরে এক বিপদ্ উপস্থিত; বিলাতের একজন বৈজ্ঞানিক একরূপ প্রমাণ করিয়াছেন, যে গোধূম বা তণ্ডুলাদি অপেক্ষা মাংসে অধিকতর বলবীর্য্য উৎপাদন করে,—এ জ্ঞানটি কুসংস্কার।

সকল প্রকার উদ্ভিদ্‌শস্যে গ্লুটেনসার নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদে এ 'সার' বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু কীমিয় অর্থাৎ রাসায়নিক দর্শনে ইহা সর্ব্বত্রই সমান অর্থাৎ এই পদার্থের ভৌতিক বিশ্লেষণ করিলে, যে কয়টি পৃথক্‌ভূত পাওয়া যায়, সেগুলি সর্ব্বত্র একবিধ পরিমাণে থাকে। যদি ছোট, বড়, নূতন, পুরাতন, দশ যোড়া তাস লও, তবে সেগুলি আকারে বা বর্ণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, যেরূপ

তাহার এক যোড়াতে যখানি সাতা, ছুরি, পঞ্জা বা বিবি থাকিবে সেইরূপ সকল গুলিতেই থাকিবে; সেইরূপ পক্ক আম্র ফল হইতেই হউক, আর নূতন তণ্ডুল হইতেই হউক, গ্লুটেনসার নিঃসৃত করিয়া, তাহার কীমিয় বিশ্লেষণ করিলে, সমান অনুপাতে অঙ্গারজন, জলজন, যবক্ষারজন ও অম্লজন্ পাওয়া যাইবে। ইহাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে এই উদ্ভিদ্-সার গ্লুটেন এবং মাংসসার গ্লুটেন একই পদার্থ। হংস ডিম্বের মধ্যে যে শ্বেত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাকে শ্বেতসার বলা যায়, তাহাই মাংসসার গ্লুটেন। কেবল ডিম্ব বলিয়া নয়, মাংস মাত্রেই এই গ্লুটেন পদার্থ আছে। মাংসগ্লুটেন এবং উদ্ভিদ্গ্লুটেন কীমিয় দৃষ্টিতে একই পদার্থ। অর্থাৎ উভয় পদার্থে একই পরিমাণে অঙ্গারজনাদি আছে।

এ পর্য্যন্ত কোন তর্ক নাই। কোন বিবাদ নাই। তাহার পর মতভেদ আছে। বিলাতের প্রাচীন কীমিয়ানগণ বলিতেন, যে গোধূম, তণ্ডুল, বা গোল আলুতে, এই মনুষ্য জীবনোপকারী গ্লুটেনসার অতি অল্প পরিমাণে আছে। লুইস প্রকাশিত

জনষ্টনের কীমিয়া গ্রন্থে লেখা আছে "ময়দায় গ্লূটেন, শত ভাগে দশ ভাগ থাকে, মাংসে ১৯ ভাগ, ভাতে ৭ বা ৮ ভাগ এবং গোল আলুতে ৮ ভাগ মাত্র থাকে।"

এক্ষণে ওয়েষ্টমিনষ্টর রিবিউর লেখক, লাইবিগ্, প্লেফেয়ার, এবং বৌসিঙ্গাটের শাসনানুসারে প্রতিপন্ন করিতেছেন, যে মাংসে শতকরা ২৫ ভাগ বলকারী পদার্থ আছে, কিন্তু দাল, কলায়, চাউল, গোমে, ৮২ হইতে ৯২ ভাগ পর্য্যন্ত আছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, যে এক্ষণে সমূহ বিপদ উপস্থিত। এখন সেকালের কথা মানিব, কি, এ কালের কথা মানিব ?

কিছুদিন ক্রমাগত মাংসাহারের পর দুই দিন চারি দিন মাংস না খাইলে লোকে আপনা আপনি দুর্ব্বল বোধ করে কেন? রিবিউ লেখক, এ প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন মাংসে অধিক পরিমাণে শরীরের পোষণ বা বল-বীর্য্য-বৃদ্ধি করে না বটে কিন্তু মাংসের 'উষ্ণ কারিতা শক্তি' আছে। মদ্যাদির ন্যায় মাংসাহারেও শরীর মধ্যে খরতর শোণিত সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং শিরা

মাংসপেশীসমস্ত উৎসাহিত হয়। এই সকল কারণে আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় যে, শারীরিক বলবীর্য্যের প্রাচুর্য্যবশত এইরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। মাংসাদি ভোজনে ক্ষণ উত্তেজিত বলোদয় হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী বল এক মাত্র শস্যাদি ভোজনেই প্রচুর দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ শস্যাহার অধিকতর উপকারী বলিয়াই, নিরামিষাহারী সিপাহীরা, গোরা সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও যুদ্ধক্ষম, এবং সেই জন্যই গোল আলু ভোজী আইরিস সৈন্য গোখাদক ইংরেজসৈন্য অপেক্ষা যুদ্ধে যশস্বী।

কথিত প্রবন্ধে মাংসাহার প্রতিষেধ পক্ষে এই-রূপ ও অন্যরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্যের দন্তাদির অবয়ব সংস্থান সেইগুলির মূল। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এবং কতকটা অনাবশ্যক বোধে এই প্রবন্ধে সেই হেতুবাদগুলি পরিত্যক্ত হইল। মাংসাহার সম্বন্ধে সেকালের মতই সত্যসিদ্ধ হউক, আর একালের মতই হউক, শিক্ষিত বাঙ্গালির পক্ষে দুইই সমান। শিক্ষিত বাঙ্গালি বা বাঙ্গালি বাবু যে অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অসার অর্থাৎ গ্লুটেন বর্জ্জিত। আমাদের আহার্য্য

একে সিদ্ধ তণ্ডুল,তাহাতে কাথনিঃসৃত (ফেণগালা); মাংসখণ্ডের সহিত বালাম অন্ন মুষ্টি একইরূপ বলকারী, ইহা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং অভিনব বৈজ্ঞানিক লেখক কর্ত্তৃক নিরামিষাহারী বাঙ্গালী বাবুর নিত্যাহারের সাফাই হয় না। বিশেষত, বাঙ্গালির শরীরে কেবল বলাভাব এমন নহে, বাঙ্গালির ধাতুতে উষ্ণতার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালি শুদ্ধ অন্নাহারী নহেন বাঙ্গালি প্রকৃত 'ভেতো।' তাহাতেই অনেকে বলেন যে, বাঙ্গালির এমন খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, যে তাহাতে একটু 'রক্ত গরম' হয়। শরীরে কেবল বল নয়, সঙ্গে সঙ্গে তেজ থাকে, সাহস থাকে। যদি বাঙ্গালি বাবুর তেজ সাধনের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে, স্বীয় জ্ঞান হত্যার পাপ-সম্ভাবনা শিরে গ্রহণ করিয়া, ঔদ্ভিজ্জ উষ্ণকারিত্বের জন্য শৌণ্ডিকালয়ের আশ্রয় অবলম্বন অথবা জীবহত্যার পাপ শিরে ধারণ করিয়া মাংসীয়-উষ্ণকারিত্বের জন্য কালীবাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ—ইহার কি করা তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহার মীমাংসা করিতে আমরা অক্ষম। তবে এ কথা বলিতে পারা যায়, যে যদি

কেবল বলাধানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্বাথ সহিত আতপান্ন অথবা সঘৃতখেচরান্নই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালি যে, কখন পুরাতন সিদ্ধতণ্ডুলের মায়া ভুলিবে, অথবা ফেণসুদ্ধ আলো-চালের ভাত খাইবে এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

শক্তি।

মনুষ্য, যে কোন শক্তিরই হউক, আধিক্য দেখিতে পাইলেই তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়। হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই বিস্ময় হইতেই পরক্ষণে ভক্তি জন্মে; ক্রমে সেই শক্তির উপাসনা করে, শক্তিধরের সেবা করে, তাহার অনুকরণ করে; সুতরাং যদি সে ক্ষমতাটির কোন মন্দ ফল থাকে অথবা ভাল ফল না থাকে, উভয়ত্রই মন্দ হইতে আরো মন্দ জন্মিতে থাকে।

যেরূপ কোন ক্ষমতা বিশেষের আধিক্য দেখিলে সাধারণ মনুষ্য প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ কোন নূতন শক্তির আবির্ভাব মাত্রেই সকলে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করে ও ভক্তি উপহার প্রদান করে। ইহাতেও ভাল মন্দ বিচারের ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং নবীনতা হইতেও অনেক মন্দ ফল ফলে। কিন্তু নূতনের প্রতি ভক্তি অধিক দিন থাকে না, অথচ বিশাল শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দীর্ঘস্থায়িনী; এমন কি মনুষ্যসৃষ্টি কালাবধি আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত একই রূপ রহিয়াছে, বলিলেও বলা যায়।

ভ্রষ্ট সমাজে যেথানে লোকের রুচির ব্যত্যয় জন্মিয়াছে, যেখানে কুসংস্কারে বিবেচনাকে জড়ীভূত ও অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। সেখানে সচরাচর লোক প্রায়ই নবীনতার ও আধিক্যের প্রশংসা করিতেই ব্যস্ত থাকে। ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারে না।

এইরূপ সমাজের সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, প্রবলা বা প্রখরা শক্তি মাত্রেই সুফলদায়িনী অর্থাৎ শক্তি বিশেষের আধিক্য থাকিলেই হইল, তাহাই যথেষ্ট; শুদ্ধ যথেষ্ট নহে, তাহাই প্রার্থনীয়, অনুকরণীয় ও প্রশংসনীয়। এটি একটি ভুল।

প্রথমত প্রবলা শক্তি হইলেই হইল না, কোন বিশেষ শক্তি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধিনী হওয়া চাই। একান্ত পক্ষে উদ্দেশ্য সাধিনী না হয়, উদ্দেশ্য-সাধনাভিসারিণী হওয়া চাই। যে শক্তি হইতে মানবসমাজের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না, তাহার প্রশংসা করিব কেন? সে শক্তি থাকিলেই কি, না থাকিলেই বা কি?

কৃষ্ণানন্দের একটি বিশেষ ক্ষমতা এই যে তিনি যখন মনে করেন, তখনই নিদ্রিত হইতে পারেন। এ শক্তির বিশেষ প্রশংসা কি? কৃষ্ণানন্দ অতি দুর্ব্বৃত্ত হইলে, এবং তাঁহার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভোগের ইচ্ছা বলবতী থাকিলে, সমাজের মঙ্গল আছে বটে, নতুবা কৃষ্ণানন্দের এই শক্তিতে সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তবে যদি কৃষ্ণানন্দ এই শক্তি সাধারণকে শিক্ষা দিতে পারেন, তাহাতে বলিষ্ঠ বা রোগী, ক্ষুধার্ত্ত বা যোগী, সকলেই এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কোন না কোন উপকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির প্রশংসা করি। তখন সেই আদ্যাশক্তি একটি মহাবিদ্যা হইল। সেই শক্তিরূপ মহাবিদ্যার উপাসনা করিতে পারি; কেন না সেই শক্তি হইতে একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়; বর্ত্তমানে সাধিত না হইলেও ভবিষ্যতে সেই শক্তি কর্ত্তৃক মঙ্গলসাধন হইলেও হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়।

দ্বিতীয় কথা। উদ্দেশ্য-সাধিনী হইলেই শক্তির গৌরব বটে, কিন্তু তাহাতে শক্তিধরের গৌরব হয় না। শশিশেখর শর্ম্মা সটীক সমস্ত স্মৃতিতত্ত্ব

কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, ইঙ্গিত মাত্রে আদ্যন্ত আও-ড়াইতে পারেন; শক্তিসম্বন্ধে ইহা গৌরবের কথা বটে, ইহাতে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, এবং এরূপ শক্তির প্রচারে সমাজের ভূরি মঙ্গল হইতে পারে। তথাপি শশিশেখরের প্রশংসা করি না। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য,—প্রকৃত সেকেলে 'ভট্টাচার্য্য।' তিনি শুষ্ক পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসেন, লোকে তাঁহাকে অপরিষ্কার বলিয়া ঘৃণা করে। তিনি সৈন্ধব বলিয়া ব্রাহ্মণীকে ফটকিরী আনয়ন করিয়া দেন, ব্রাহ্মণী আহার কালে, নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যকে উদ্দেশে ভৎর্সনা করেন।

শশিশেখর ষ্টেশনে টিকিট কবচ লইয়া সজীব পদার্থ জ্ঞানে প্রথমে রেলগাড়ীর কলের সহিত কথোপকথন করিতে যান, বিদেশী গার্ড তাঁহাকে বেগে ধাক্কা দিয়া ফেলাইয়া দেয়; তিনি মাসত্রয় দারুণ শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। স্থূল কথা শশিশেখরের কিছুমাত্র বিষয় দৃষ্টি নাই। তাহা-তেই শশিশেখরের প্রশংসা করি না। শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের নিজ মানসিকগঠনে শক্তি সামঞ্জস্য

নষ্ট করিয়াছেন। তিনি ধারণাশক্তির আত্যন্তিকী চালনা করিয়া, পর্য্যবেক্ষণার আত্যন্তিক ক্ষয়-সাধন করিয়াছেন।

অতএব মনুষ্যের কোন বিশেষ শক্তির প্রশংসা বা তাহার অনুকরণ করিবার পূর্ব্বে দুইটী বিষয় দেখা উচিত। প্রথমত সেই শক্তির দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে কি না। দ্বিতীয়ত সেই শক্তি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই শক্তি-ধরের শারীরিক বা মানসিক গঠনে শক্তিসামঞ্জস্য আছে কি না।

বাঙ্গালির বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, বোধ হয় তৎসময়ে অন্য কোন দেশে তাদৃশ ছিল না; অপিচ অনেক দেশের অনেক প্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভারতের বিজ্ঞান সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে; বিশেষত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে, যে কালিফ আল্ মামুন ভারত হইতে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ সমেত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বোগ্‌দাদ্ নগরে লইয়া যান, এবং তিনিই তাহা স্বদেশে প্রচলিত করেন। পরে ইউরোপ খণ্ড মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, ঐ জ্যোতিষ বিজ্ঞান তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক ইউরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের এখন সে গৌরব নাই, সে কীর্ত্তি নাই, সে বিদ্যাও নাই এবং সে বিজ্ঞানও নাই। এক্ষণে ভারত-ভূমি পূর্ব্বশ্রী-ভ্রষ্ট। ইহাতে সকলই এক্ষণে নূতন! অত্রি, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আর্য্যগণ চিতা হইতে পুনরুত্থান করিয়া আসিলে,

এই ভারত, সেই পূর্ব্বতন আর্য্য ভারত বলিয়া কখনই চিনিতে পারিবেন না।

আর্য্য রাজাদিগের সময়ে ভারতবর্ষ বিজ্ঞান বিষয়ে যে, যথেষ্ট ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক জ্যোতিষ বিদ্যমান থাকাতে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্যান্য বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা ছিল। রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এত ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে, বোধ হয় কোন দেশে কোন কালে ঐ বিদ্যাদ্বয় তদ্রূপ ঔৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয় নাই। ব্যাস, বাল্মীকির সময়েও যুদ্ধাদি, যে, আধুনিক যুদ্ধের ন্যায় বিজ্ঞান সাহায্যে সম্পন্ন হইত, তাহা রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক দুঃখের বিষয় এই যে, তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না হওয়াতে এবং যবনদিগের মূঢ়ত্ব ও ঈর্ষা বশত অনেক বিজ্ঞানের লোপ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী বা বিদ্যানুশীলনকারীদিগকে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। কিন্তু এইরূপ রাজকীয় উৎসাহের অভাবেও যে, হিন্দুগণ মুসল-

মানদিগের সময়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, তাহা জয়পুরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ কৃত স্থাপিত কাশীর মাণমন্দির এবং দিল্লির, মথুরার ও জয়পুরের জ্যোতিষ গৃহ দর্শনেই প্রতীয়মান হয়।

আজিকালি আমাদিগের কোন বিষয়ে উন্নতি না হইলেও, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করা আমাদিগের প্রধান কার্য্য; ইহাতে যে আমাদিগের ক্রমশ উন্নতি সাধন হইতে থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক ভারতবর্ষ ইংরেজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, তাঁহাদিগের বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান দর্শনে আমাদিগের আশা হইয়াছিল যে, হিন্দুগণ অচিরাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু সে আশা এখনও ফলবতী হয় নাই।

বাঙ্গালিগণ সাহিত্য ইতিবৃত্তাদিতে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ঐঐ বিষয়ে ইউরোপীয় সর্ব্বজাতির সমকক্ষ হইতে অচিরাৎ পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহারা সকলেরই পশ্চাদ্বর্ত্তী। বিজ্ঞানের চর্চ্চাও নাই, বিজ্ঞানচর্চ্চাকারীদিগের উৎসাহও নাই। ইংরেজি বিদ্যালয়ে যে

প্রকার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ছাত্র-দিগের প্রকৃত যত্ন হয় না; এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পর তাঁহারা যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহাতেও বিজ্ঞানচর্চ্চার কিছুমাত্র সংস্রব থাকে না। অধিকাংশ বাঙ্গালির বিদ্যোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য কেবল কেরাণীগিরি, ডাক্তারি, ওকালতি; কিম্বা ইঞ্জিনিয়রি করা মাত্র। কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যে বিজ্ঞানচর্চ্চার কিছু মাত্র প্রয়োজ নাই। যাঁহা-দিগের কেরাণী হওয়া উদ্দেশ্য, তাঁহারা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পর্য্যন্ত করেন না; তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিজ্ঞানচর্চ্চার ভরসাও করা যাইতে পারে না। যাঁহারা ডাক্তার, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই ত বিজ্ঞান চর্চ্চা নাই, অধিকন্তু আবার পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কিমিয়াদি পর্য্যন্ত ভুলিয়া থাকেন। উকিলগণ সর্ব্বদা আইন, নজীর লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার তাঁহাদিগের অবসরই নাই; তাহাতেই বিদ্যালয়ে অধীত বিজ্ঞান সকল ক্রমশ ভুলিয়াও যান। বাকি ইঞ্জিনিয়ারগণ;—তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিজ্ঞা-নের উন্নতি এবং চর্চ্চা আমরা অনেক ভরসা

করিতে পারি বটে কিন্তু,—তাঁহারা সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় যন্ত্রাদির উপর নির্ভর করেন এবং আপন অপেক্ষা উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করেন মাত্র।

কোন জাতি বিজ্ঞানবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে, শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বাঙ্গালিদিগের সর্ব্ব বিষয়ে ইংরেজই ভরসা; আমরা এখান হইতে ইংলণ্ডে তুলা ও পাট পাঠাইলে, বিলাতীয় কল-কৌশলে তাহাতে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আসিলে, তবে আমাদিগের তাহা পরিধানাদির জন্য ব্যবহৃত হইবে। আমাদিগের দেশীয় বস্ত্র যন্ত্রাদি ব্যতিরেকে প্রস্তুত হওয়াতে এত দুর্মূল্য যে, তাহা সাধারণের ব্যবহার যোগ্য হওয়া দুঃসাধ্য। আমরা সময় নিরূপণের নিমিত্ত যে ঘড়ি ব্যবহার করি, তাহা ইউরোপ খণ্ডে বা ইউরোপীয় কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রস্তুত না হইলে, আমাদিগের কেবল মাত্র বালি ঘড়ি ও জলঘড়ি ভরসা হইত। ইউরোপীয় দূরবীক্ষণ ব্যতিরেকে, বোধ হয় আমাদিগের গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শন, চিত্রপটে শেষ হইত। যাহাহউক শিল্পাদি বিষয়ে সর্ব্ব

জাতির আপনাদের নিজের উপর নির্ভর কতকটা করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান ও শিল্পাদি কার্য্যের দ্বারা অনেক ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহের একটী পথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে; আমাদিগের দেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং লোক বৃদ্ধি বশত অনেক ব্যবসায়েরই উপায়ের হ্রাস হইয়াছে; অতএব অন্যান্য উপায়ের পথ উদ্ঘাটন ব্যতীত সাধারণের কষ্ট দূর হইতে পারে না।

আমাদিগের ভারতবর্ষ একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী বিশেষ। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য কোন স্থানে যাওয়া আবশ্যক করে না। এই স্থানেই এই সকল বিষয়ের সুন্দর রূপ শিক্ষা লাভ হইতে পারে। দেশভ্রমণ যে শিক্ষা লাভের বিষয়ে কতদূর সহায়তাকারী, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। শিক্ষালাভার্থে আমাদিগের দেশীয় কৃতবিদ্যগণ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন, এবং ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহাদের দর্শনাদি ফল লিপিবদ্ধ করেন, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ইংরেজ ভ্রমণকারীগণ খাদ্যদ্রব্য, শয়ন স্থান ও শীতোষ্ণতার বিষয়ে অনেক বিদ্যা

বুদ্ধি ব্যয় করিয়া থাকেন; আমরা আমাদিগের কৃতবিদ্যগণকে এই সমস্ত বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইতে বলিতেছি না; তাঁহারা ভারতের প্রাচীন বিষয় সমূহের যাহা কিছু দর্শন করেন ও ভারতবর্ষীয় জীব সম্বন্ধে, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে ও ভূসম্বন্ধে যাহা কিছু দর্শনাদি করেন, তাহাই তাঁহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিতে বলি; কারণ তাহাতে অনেক ব্যক্তির ভারতসম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে; এবং সেই জ্ঞানলাভ হইতেই ক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে লালসা হইতে পারে। যতদিন এরূপ প্রবৃত্তি লোকের মনে না জন্মায়, ততদিন বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতি কামনা, কেবল কামনাই থাকিবে।

একতা।

বড় বড় নগরে ও রাজধানীতে বড় বড় লোকে নানাপ্রকার সভা সংস্থাপন করিয়া সময়ে সময়ে তাহার 'অধিবেশনে' দেশের শুভাকাঙ্ক্ষায় উত্তমাধম নানা বিষয়ের বিচারবিতণ্ডায় বিশেষ যত্নবান্ বটেন, কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের একতার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বেথুন সোসাইটী, টাউন হলে সুবর্ণ খচিত রত্নমালা বিভূষিতা চাকচিক্যশালিনী সভা প্রভৃতিতে অশেষ গুণালঙ্কৃত মহামহিম মহোদয় ব্যক্তিগণের সমাগমের ফল কি হয়? উত্তর,— সভার কার্য্যাবলী কেবল সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র। "অমুক শ্বেতপুরুষ বাঙ্গালির পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে দু কথা বলিয়াছেন," "অমুক কৃষ্ণ পুরুষ গবর্ণর জেনারেলের ভূরি ভূরি প্রশংসা বাদনে বাক্‌পটুতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন;" "আয়, ব্যয় আমদানি, রপ্তানি,—জমিদারদিগের রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে প্রস্তাব হইয়াছিল," ইত্যাদি।

ইহাতে আপামর সাধারণ লোকের, মনের একতার কি হইল? আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির আধিক্য দেখাইতে পারিলেই, কি সুচারুরূপ কার্য্য হইল?

এ প্রকার সভাদ্বারা বঙ্গ সন্তানগণের মধ্যে একতা বৃদ্ধির কিছুই নিদর্শন লক্ষিত হয় না; যেখানে ছোট বড়, ইতরবিশেষ, সেখানে একতার প্রত্যাশা কি? তাই বলি এক্ষণে একতা সম্বন্ধে যদি কিছু সুযোগ থাকে, তাহা কেবল তীর্থস্থানে দেখা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু নগর-সংকীর্ত্তনে সকল বাঙ্গালির পরস্পরের প্রতি পরস্পরেরদ্বেষ, হিংসা ও মনোমালিন্য দূর করিয়া, পরে সেই হরিনাম গুণেই একতাশৃঙ্খলে দৃঢ় বদ্ধ করিয়াছিলেন। এখন কেহ সাহস করিয়া ভক্তিসহকারে ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তিনি লোকসমাজে উপহসিত হন। ইংরেজি সভ্যতার বৃদ্ধিতে এরূপ একতা অন্তর্হিত হইতেছে,এখন কৃতবিদ্যগণ প্রকৃত বিশ্বাসে লোককে বুঝাইয়া দেন, যে বারইয়ারি অতি কু-প্রথা। এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা সচরাচর প্রায় সকল বিদ্যালয়ে হইয়া থাকে। আমরা সভ্য, কাজেই সকল সভ্য দেশের গাম্ভীর্য্য ভাব মুখে ধারণ পূর্ব্বক বলিয়া

থাকি, এ সব অসভ্যতা ও অলীকামোদ মাত্র। ইহাতে বহু লোকের সমাগমে বায়ু দূষিত হইয়া নানা প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। ছোট লোকের সংসর্গে কোন কাজে লিপ্ত থাকিলে মান থাকে না। কিন্তু পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন এটী আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। যে সকল লোকে অপর সময়ে আলাপ করিতে কিম্বা এক বিছানায় বসিতে সাহস পায় না, তাহারাও ঐ বারইয়ারির কয়েক দিন সমভাবে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পাইয়া হর্ষ পূর্ব্বক মনের আহ্লাদে উন্মত্ত হয়।

এইরূপ কোন এক বিষয়ে, সকল শ্রেণীর প্রেম স্নেহ ও অনুরাগে যতটা মনের মিল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। দলাদলি, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য কিছুই থাকে না। ইয়ুরোপ দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা যবনদের হস্ত হইতে যিরুজিলাম মুক্ত করণার্থ দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত আট জন মহৎ লোকের অধীনে যখন আটটি ঘোর তুমল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সকল প্রকার লোক ঐ বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সাহিত্য, নৌবিদ্যা, জাহাজ নির্ম্মাণ ও কৃষি বিদ্যা-দিতে যে কত উন্নতি হইয়াছিল তাহা সকলেই

জানেন। সেরূপ কোন কার্য্যে যে ভারতবাসী কখন মিলিত হইবে, অতি বড় মূর্খের সেরূপ স্বপ্ন বিশ্বাসও নাই, তবে কি না কোনরূপ দেবোৎসব মেলাদিতে সকলে যদি মধ্যে মধ্যে একত্র হয়, নূতন সিবিলিজেশনের বা সভ্যতার দোহাই দিয়া আর তাহাতে ব্যাঘাত দেও কেন? জান না তোমার অভীপ্সিত সভ্যতার নীচে সুড়ঙ্গপথ খনন হইতেছে। এই অন্তঃশূন্য সভ্যতা লইয়া কি করিবে?

রাজনীতি-শিক্ষা।

এইটি রাজার কর্ত্তব্য, এইটি রাজার কর্ত্তব্য
য়, এইরূপ কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়।
কস্তু কি কি কার্য্য রাজার প্রকৃত কার্য্য, আর
ক কি কার্য্যই বা তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক করিয়া
াকেন, আর কতগুলিই বা তিনি জবরদস্তিতে
করিয়া থাকেন, তাহা স্থির করা বড় কঠিন।
আফিসের কেরাণী বাবু কাপি করিবেন, দপ্তরী
তাহার কলম কাটিয়া দিবে; সে অবাধ্য হইলে
তিনি আফিসের কর্ত্তাকে বলিয়া দিবেন। যখন
কেরাণী বাবু নিজে কলম কাটিয়া লয়েন, তখন
তিনি অনুগ্রহ করিয়া অতিরিক্ত কর্ম্ম করেন, আর
যখন তিনি দপ্তরীর শৈথিল্য জন্য তাঁহাকে
ভৎ'সনা করেন, তখন তিনি জবরদস্তি করিয়া
আপনার প্রকৃত কার্য্যের অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া
থাকেন; আর সাহেব যখন তাঁহাকে এক্সচেঞ্জ
হইতে মেম সাহেবের জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া
আনিতে পাঠাইয়া দেন, তখন সাহেব তাঁহাকে
জোর করিয়া অতিরিক্ত কার্য্য করিতে বাধ্য

করেন। রাজাও এইরূপ ত্রিবিধ প্রকারে রাজ-কার্য্যের অতিরিক্ত কার্য্য করেন।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'রাজা পশ্যন্তি কর্ণাভ্যাং' অর্থাৎ রাজারা চক্ষে দেখেন না, কাণে শুনিয়া বিচার করেন; তাই যদি ঠিক হয়, তবে বোগদাদের কালিক হারুণ আলরসীদ যে প্রতি রজনীতে ছদ্ম-বেশে গলিতে গলিতে, গোয়েন্দাগিরি করিয়া বেড়াইতেন, সেটি তাঁহার অতিরিক্ত সকের কার্য্য বলিতে হইবে। ভারতবর্ষীয়গণের বিশ্বাস যে, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন রাজার কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরি-গণিত, কিন্তু ইউরোপীয় অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। প্রুসিয়ায় রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, প্রজা সকলকে উপযুক্ত শিক্ষাদান; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন না।

রাজার কর্ত্তব্যকার্য্যের যে সীমা আছে, এবং রাজা যতই অল্প কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, ততই যে প্রজার পক্ষে ভাল, তাহা ভারতবর্ষীয়েরা সাধারণতঃ বুঝেন না।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে, পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ।

পিতা পুত্রের মধ্যে যেমন এইরূপ সম্বন্ধ, রাজা প্রজা মধ্যেও ঠিক সেইরূপ। যে পিতা ত্রিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে 'ননীদুলালি' করিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন, তাহার পুত্র যেমন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়, সেইরূপ, যে, রাজশ্রেণী চিরদিন প্রজাকে "লালন পালন" করিতে থাকেন, তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জও সেইরূপ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে। তবে যে সমাজ নিতান্ত অপোগণ্ড, সে সমাজকে অবশ্য লালন করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস, যে, এই বৃহৎ ভারতসমাজ অপোগণ্ড সমাজ নহে, সুতরাং এ সমাজে সামাজিক সংস্করণ জন্য রাজার সাহায্য প্রার্থনা করা, কেবল আপনা আপনি হেয়কল্প হইয়া যাওয়া মাত্র।

আর একটি কথা আছে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা কর্ত্তব্য। যখন রাজা বিভিন্নজাতীয় ও বিদেশীয়, তখন আমরা নিতান্ত অক্ষম বোধ হইলেও, রাজার সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইংরেজরাজ আমাদের সমাজের আকৃতি প্রকৃতি কিছুই বুঝেন না। বুঝিলেও আমাদের সমাজের উৎকৃষ্ট নীতিগুলির সহিত সহানুভূতি করিতে পারিবেন না।

সমাজ সংস্কারের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজসাহায্য লইয়া সমাজসংস্কার করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। রাজা ভাল মন্দ, দুইটিকেই সমানবিবেচনা করেন। আজি আপনার সহিত মিলি একত্র হইয়া মন্দটি উঠাইয়া দিবেন, কালি কখন মিশনরীদের সহিত এক হইয়া ভালটী উঠাইবার চেষ্টা করিবেন, তখন যে বিষম বিভ্রাট হইবে; তখন এই পতনোন্মুখ সমাজকে কে রক্ষা করিবে? সেই জন্য আমরা বলি, যে এই সামান্য কথা হইতে আমাদের মহতী শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। যে সকল কার্য্যে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা বা সাহেবেরা হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, সমাজ-সংস্করণের সুবিধা মানসে, বা দেশের উপকারের জন্য সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। যখন পারিব আপনারা করিব; যতদিন না পারিব, অপেক্ষা করিব। রাজনীতি সম্বন্ধে এই শিক্ষা, মহতীশিক্ষা।

অর্জ্জন-স্পৃহা।

পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের যে অর্থের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ছিল তাহাতে আর দ্বিমত নাই। হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি আতপতণ্ডুলভোজী, নিরামিষাশী, ভিক্ষোপজীবী ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তৎতাবতেই অর্থ বিদ্বেষ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

সর্ব্বধনাধ্যক্ষ কুবের দৈবশক্তিহীন, নিস্তেজ, তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে অধম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সদাশিব অর্থশূন্য, অথচ কেমন প্রতাপশালী। রাবণ প্রবল প্রতাপান্বিত, ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত; সুতরাং ঘোর অত্যাচারী, পাপী, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত বিষয়ে একটু গোল আছে, যেহেতু কৃষ্ণ বহুকালাবধি মধ্যবিত্ত গোপ সন্তান রূপে বর্ণিত; পরে তিনিই আবার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; বিপুল ক্ষমতাবলে হিন্দুদিগের ঈশ্বরাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ বর্ণনেও অর্থদ্বেষ বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের

বাল্যক্রীড়ার যত বিবরণ দেখা যায়, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের তেমন কিছুই দেখা যায় না। যত কিছু অদ্ভুত, অলৌকি কাণ্ড, সমস্ত বাল্যকালে গোপগৃহে থাকিয়া। রাধা কৃষ্ণের প্রেমে লোকে বিহ্বল; কুব্জাকৃষ্ণের প্রতি লোকের তত আস্থা দেখা যায় না। ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ সংসারী, অর্থপ্রয়াসী, কুটিল রাজনীতিপরতন্ত্র সুতরাং অমনি তাঁহার প্রতি হিন্দুবৈষ্ণবদিগের ভক্তির লাঘব দৃষ্ট হইতেছে।

একজন এমন একটি দ্রব্যে ব্যবসায় আরম্ভ করিল যে ঐ দ্রব্যটি লোক মাত্রেরই দুঃসময়ে প্রয়োজন, সুতরাং ক্রেতা দর কসাকসি করিতে অনিচ্ছুক। এরূপ ব্যবসায়ী ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের ধনী হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"; সেই ব্যাধি অপনয়নকারী চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্যজাতি যে অর্থ সংগ্রহে সফলকাম হইবেন তাহা এক প্রকার স্বীকার্য্য। আবার সেই বৈদ্যজাতি নানা প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অর্থদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যজাতির প্রতি কোপদৃষ্টি করিলেন!

সুবর্ণবণিকদিগের জাতিপাত সম্বন্ধে নানারূপ জনরব আছে; কিন্তু হইতে পারে যে, অর্থসঞ্চয় স্পৃহাই উহার মূল কারণ। একে সোণার কারবার, তাহাতে আবার সুদের ব্যবসায়; অর্থসঞ্চয়ের এরূপ নিশ্চয়তা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং "সোণার বেণে" বড় ঘৃণার্হ, উহার ছায়া সংস্পর্শেও পাপ হয়, এরূপ বিশ্বাস হিন্দুসমাজে সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন ইউরোপখণ্ডে অর্থ-পিশাচ যিহূদীদিগের প্রতি জনসাধারণের অবিকল এইরূপ ঘৃণা ছিল।

কয়েক বৎসর হইল হিন্দু হইয়া কেহ বিলাতে যাইতে পারে কি না এবিষয়ে এক বিষম তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। স্মরণ হইতেছে পণ্ডিত-মণ্ডলী ব্যবস্থা দেন যে অর্থলোভে বিলাতে গেলে শাস্ত্রমতে জাতিচ্যুত হইতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ, হিন্দুমণ্ডলীর আহ্লাদের বিষয়।

শুনিতে পাওয়া যায় যে রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বহু অর্থ ব্যয়ে ৺বারাণসীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন পরে মানবলীলা সম্বরণ করেন; কথিত

আছে, যে স্মার্ত্তঠাকুর এইরূপে অর্থ ব্যয়ের উপ-কারিতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়া যান, যে "ধনানি মোক্ষ্যাণি"।

যাহা হউক সাধারণ কথায় বলে, যে "চয়ে, রঘো বলা, তিন কলির চেলা"; এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আমাদের বাঙ্গালার অনেক ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে তিনি যদি আপনার কূটতর্কশক্তি চালনা করিয়া বাঙ্গালার গৃহে গৃহে সিদ্ধ তণ্ডুল ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই এত দুর্ব্বল হইতাম না। অন্যান্য আর্য্যসন্তানের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকিতাম। আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে যদি তিনি "ধনানি মোক্ষ্যাণি" বলিয়া গিয়া থাকেন, তাহাতেও তিনি বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন।

যিনিই যাহা বলুন, একে সেই প্রাচীন সংস্কৃত বচন তাহার উপর আবার এখনকার শ্বেতাঙ্গগণের অর্থব্যবহারের বীজমন্ত্র,—এই দুই একত্র সঞ্চারিত হইয়া ভারতবাসীর মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এখন যেখানে যাও শুনিবে যে সকলে একবাক্যে

বলিতেছে "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ"। এটা কিন্তু ঘোর মিথ্যা কথা। যদি তাহা হইত তবে ক্রীশস্ বা রাবণ রাজ্যভ্রষ্ট এবং সবংশে নষ্ট হইলেন কেন? রোম রাজ্যের পতন হইল কেবল অর্থ বৃদ্ধিতে। রোমানেরা অর্থ বৃদ্ধিতেই অলস হইয়া পড়েন ও ক্রমে অধঃপাতে যান। যদি অর্থে সকলই হইত তবে এই যিহুদী জাতিরা চিরদিন বাস্তু হীন হইয়া যত্র তত্র তাড়িত বিতাড়িত হইয়া অকূল সংসার-সাগরে বিচরণ করিবে কেন? অর্থে যদি সকলই হইত তবে পশ্চিমের শেঠিয়ারা বাঙ্গালির পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইবে কেন? অর্থে যদি সকলই হয়, তবে বালুচর আজিমগঞ্জের কুবেরগণের ওরূপ হীনাবস্থা কেন? আর আমাদের সুবর্ণবণিক ভ্রাতৃবৃন্দই বা এরূপ নিষ্প্রভ কেন? অর্থে যদি সকলই হয়, তবে অষ্ট্রেলিয়া বা কালি-ফর্ণিয়া পরহস্তগত হইল কেন? বাস্তবিক অর্থে কিছুই হয় না। কেবল সাহসে হয়, কেবল বুদ্ধিতে হয়, কেবল বিক্রমে হয়, কেবল একাগ্রতায় হয়, কেবল অধ্যাবসায়ে হয়, কিন্তু কেবল অর্থে কিছুই হয় না। কেন না ধন বা অর্থ, টাকা বা

কড়ি প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল বিনিময়ের টিকিট মাত্র। কেবল টিকিটে কোন কাজই হয় না, যদি জাতীয় উন্নতি চাও, তবে কেবল "হা কড়ি! যো কড়ি" বলিয়া চীৎকার করিও না। জাতি মধ্যে একতা কর, হৃদয়ে সাহস কর, শরীরে বল কর এবং মনে একাগ্রতা কর।

বিদেশ ভ্রমণ।

যদ্রূপ দুঃখাবস্থায় না পড়িলে লোকে সুখানুভব করিতে বিশেষ সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিদেশ গমন না করিলে জননী জন্মভূমির মাহাত্ম্য জানা যায় না। বিদেশে অধিককাল বাস করিলে জন্মভূমির উপর নৈসর্গিক স্নেহ দ্বিগুণতর হইয়া উঠে। জন্মভূমির যেসকল বিষয় পূর্ব্বে কষ্টকর বলিয়া মনে মনে বোধ হইত—যথা গৃহবিবাদ, শত্রুতা, দেশীয় শাসন-প্রণালীর অব্যবস্থা ইত্যাদি—সেই সকল বিষয় এক্ষণে মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়; জন্মভূমির আনন্দবর্দ্ধনকারী বিষয় সকলই কেবল প্রবাসীর স্মরণপথে উদিত হইতে থাকে। স্বদেশের যেসকল ক্ষুদ্র বস্তু, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পূর্ব্বে লক্ষ্যই হইত না, এক্ষণে সেই সকল তুচ্ছ বস্তুই প্রোষিতের মনে চমৎকার ভাবসম্বলিত হইয়া উদয় হইতে থাকে; ফলতঃ জন্মভূমি এক অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া তাঁহার নয়নপথে উদয় হয়; জন্মভূমি সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় তখন গুণ-সংযুক্ত ও দোষ বিবর্জ্জিত বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মে। যদি

অন্য কোন দেশীয় রীতি, নীতি, প্রণালী, পদ্ধতির ঔৎকর্ষ দর্শনে স্বদেশীয় কোন রীতি, নীতি, প্রণালী, পদ্ধতি কুৎসিত বা অসাম্য ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, তবে প্রবাসী শেষোক্ত ঐ সকল বিষয় কি প্রকারে সংশোধিত বা উন্নত হইবে, তাহারই চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েন। তখনই তিনি যথার্থ দেশ-হিতৈষিতা ব্রতে ব্রতী হন।

কিন্তু বঙ্গের কি দুর্ভাগ্য! হতভাগ্য লোকের অদৃষ্টে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, বঙ্গেরও সেইরূপ ঘটিয়াছে—যাহা স্বাভাবিক, তাহা অস্বাভাবিক রূপে সংঘটিত হইতেছে। যেসকল বঙ্গীয় সন্তান, শিক্ষা লাভার্থই হউক, বা ভ্রমণকৌতূহল চরিতার্থ করণোদ্দেশেই হউক, বিদেশে গমন করেন, কোথায় তাঁহারা স্বদেশানুরাগে পূর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, না তাঁহারা বিজাতীয় পরি-চ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক দেশীয় রীতি, নীতি, ব্যবহারাদির প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। আমরা এমন বলিতেছি না যে, আমা-দিগের দেশে যাহা কিছু আছে সকলই উৎকৃষ্ট; কিন্তু এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন

দেশের রীতি, নীতি, প্রণালী, পদ্ধতি প্রভৃতি কারণ ব্যতিরেকে সমুদ্ভূত হয় না, এবং কারণ ব্যতিরেকে প্রচলিত থাকে না। সাময়িক, সামাজিক, এবং দেশীয় অবস্থাই এই সকলের মূলীভূত কারণ। সেই সকলের পরিবর্ত্তনে রীতি, নীতি, ব্যবহারাদিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহাতে দুই একটি বিষয় মন্দ থাকে বলিয়া যে সকলই মন্দ, এরূপ বিবেচনা ভ্রমমূলক এবং যাঁহারা কেবল বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া এইরূপ অনুমান করেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখেন না।

যাঁহারা বিদেশ গমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই এইরূপ করেন, আমরা এমত বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই এইরূপ করিতে দেখা যায়। বিদেশীয়গণের আপন আপন আচার ব্যবহারাদির উপর আস্থা ও যত্ন দেখিয়া তাঁহাদিগেরও স্বদেশীয় আচার ব্যবহারাদির প্রতি আস্থা ও যত্ন দৃঢ়ীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ যদি এমন কোন দৈবশক্তি থাকিত, যে তাঁহারা তৎ-

প্রভাবে একেবারেই বিজাতীয়দিগের মধ্যে পরি-ভুক্ত হইতে পারিতেন—স্বদেশের নাম গন্ধ কিছু-মাত্র গাত্রে লাগিয়া থাকিত না—তাহা হইলে এই সকল মহাত্মারা সেই দৈবশক্তির অনুধ্যান এবং আশ্রয় গ্রহণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না।

যাঁহারা জাতীয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশীয় ব্যবহারাদি পরিগ্রহ করেন, তাঁহারা স্বজাতির ও যে জাতির ব্যবহারাদি অবলম্বন করেন, সে জাতির—উভয় জাতিরই যে, হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইবেন, তাহাতে বৈচিত্র কি! যখন তাঁহারা পরিভ্রমণ বা বিদ্যোপার্জ্জন জন্য বিদেশে গমন করেন, তখন তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের হিতসাধন হইবে, লোকে এইরূপ প্রত্যাশা করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমনান্তর যাহা কিছু দেশীয়, তৎসমুদ-য়ের উপর ঘৃণা প্রদর্শন করেন। দেশীয় লোকেরাও নৈসর্গিক নিয়মানুসারে সেই ঘৃণা প্রতিদান করে। সুতরাং হিতসাধন দূরে থাকুক একটা কলঙ্ক রটিয়া যায় যে, বাঙ্গালি আপনার ভাল আপনি দেখিতে পারে না, কেবল পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি করে মাত্র।

ভারতবর্ষ ইংরাজগণের বিদেশ, জয়লব্ধ বলিয়া

ভারতে তাঁহাদের সত্ত্বও জন্মিয়াছে; তথাপি তাঁহাদিগের প্রকৃতি বিদেশ গমনকারী বাঙ্গালীদিগের ন্যায় নহে। ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা জন্মভূমি ভুলেন না বা ভুলিতে পারেন না। বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, ভারতকে স্বদেশ বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের আচরণ মানুষিক ও নৈসর্গিক। বিদেশ গমন করিলে লোকের তৎস্থানীয় উত্তম উত্তম বস্তু সকলের প্রতি অনুরাগ জন্মে, অর্থাৎ তথায় যাহা কিছু উত্তম দেখেন, তাহা স্বদেশে লইয়া আসিতে ইচ্ছা করেন—এই স্বাভাবিক ইচ্ছা ইংরেজদিগের আছে। তাঁহাদের শাসনপ্রণালীতেও এইরূপ স্বাভাবিক ও মানুষিক কার্য্যের সুস্পষ্ট পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাঁহারা দেশীয় ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত কোমল ও ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত কঠোর নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ করেন,—যদিও তাঁহারা উচ্চ ও বহুমূল্য পদ সকল ইংরেজদিগকেই অর্পণ করেন,—যদিও তাঁহারা বিচারকার্য্যে স্বদেশবাসীদিগের উপর কিঞ্চিৎ সানুকূল দৃষ্টিপাত করেন,—যদিও তাঁহারা ভারতবাসীদিগের

উপর কর নির্দ্ধারণে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করেন,—তথাচ তাঁহাদিগকে আমরা দূষিতে পারি না, কেন না তাঁহাদিগের এইরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক ও মানুষিক। ইংরেজগণ দেবতা নহেন—ভিন্নদেশীয় মনুষ্য মাত্র; অতএব তাঁহাদিগের প্রকৃতি অবশ্যই মনুষ্যবৎ হইবে। তাঁহাদিগের ভারতের উপর যে স্নেহ, তাহা পিতার আত্মজের উপর স্নেহের ন্যায় হইতে পারে না, কিন্তু পালিতপুত্রের উপর স্নেহের ন্যায় মাত্র। অতএব তাঁহারা ভারত-বর্ষকে যতটুকু ভাল বাসেন, আমাদিগের ততটুকুই ভাল। যদি বল তাঁহারা যদি ভারতবাসীদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন না করিবেন, তবে ভারতের বোঝা ঘাড়ে লইলেন কেন? তাঁহারা মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় জিগীষা, লোভাদি সকলই তাঁহাদিগের আছে; ভারতবাসীদিগকে পুত্র তুল্য দেখিব তাঁহাদের মনে এরূপ ভাবের উদয় হইলে, তাঁহাদিগকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হয়। তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহারা ভারত-বাসীদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন,

তাহা অন্য কোন ভারত-জেতা করেন নাই। ভারত-বাসীগণ তাঁহাদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া যাদৃশ সুখী হইয়াছে, তাদৃশ সুখী অন্য কোন বিদেশীয় রাজার সময়ে হন নাই।

মোগল সম্রাট্‌গণও বিদেশী ছিলেন। তবে তাঁহাদিগের সহিত অন্য অন্য ভারতজেতৃগণের প্রভেদ কি? প্রভেদ কেবল "ঘর টান" বিষয়ে। মোগল সম্রাট্‌গণ যমুনাকে অক্‌সস বলিয়া জানিতেন ও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বা জন্মভূমি বলিয়া মান্য করিতেন। যাহা কিছু আছে সকলই যেন তাঁহাদের স্বীয় গৃহেই রহিয়াছে এইরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের যে সকল দোষ ছিল তাহা কেবল ধর্ম্মসংক্রান্ত। কিন্তু আকবর, জাহাঙ্গিরাদি, রাজ্য শাসনকালে কাফরদিগকে মুসলমান হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিতেন না। নাদেরশাহ ভারত আক্রমণ করিলেন —জয় করিলেন,—স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মুক্তা, কোহিনুরাদি,—ছলে হউক, বলে হউক, যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, সর্ব্বস্ব লইয়া পারস্য দেশে প্রত্যাগমন করিলেন; নাদের বিদেশী, ভারত পররাজ্য; মহম্মদ শাহকে আপন প্রতিনিধিস্বরূপে

ভারতসিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন বটে, কিন্তু ভারতকে আপনার বলিয়া জানিলে দিল্লির কোষাগার লুঠ করিয়া মহম্মদ শাহকে ভিখারী করিয়া যাইতেন না।

স্বদেশ আপনার, পরদেশ পরের; অতএব পরদেশ হইতে বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিয়া জাতীয়ত্ব উচ্ছেদ করা শ্লাঘনীয় নহে—স্বদেশের রীতি, নীতি ব্যবহারাদি বিনা কারণে পদমর্দ্দন করা শ্লাঘনীয় নহে;—কি প্রকারে ঐ সকলের উন্নতি হয়, কি প্রকারে জন্মভূমির হিতসাধন হয়, এইরূপ চেষ্টা করা যথার্থ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা করিলেই বিদেশ ভ্রমণের সার্থকতা সাধিত হয়।

আভিজাতিক গৌরব।

ধনের গৌরব আছে, বিদ্যার গৌরব আছে, বাহুবলের গৌরব আছে, এ সকল যেমন অনেকেই স্বীকার করেন, সেইরূপ আভিজাতিক গৌরব আছে, আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। একজন সামান্য শূদ্রসন্তান অপেক্ষা একজন বিপ্রতনয়কে আমরা উৎকৃষ্টতর জীব বলিতে প্রস্তুত আছি। বর্ণবিভেদেই ভারতবর্ষ উচ্ছিন্ন গিয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি না, তবে উচ্চতম বর্ণ যে এক কাল অধস্তন বর্ণের উপর কঠোর ব্যবহার করিতেন এবং ভারতের অধঃপতনের সহিত যে সেই অত্যাচারের গুরুতর সম্বন্ধ আছে, তাহাতে আমাদের সংশয় নাই। কিন্তু সেটি বর্ণবিভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল নহে; সকল প্রকার বিভেদ হইতেই ঐরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছে। কোন দুই শ্রেণী মধ্যে বাহুবলের বা ধনের তারতম্য হইলেও ঐরূপ হইয়া থাকে।

যাহাই হউক ব্যক্তিবিশেষের দোষ বা গুণ গণনায় তাহার "অভিজাত" বা বংশপরিচয় যে

একবারে গণনীয় নহে, এ কথাটি নিতান্ত অসার। মিশনরিগণ ভারতে আসিয়া যাহা কিছু নূতন দেখিয়াছিলেন, সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহারই উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তাহা দেখাদেখি অনেক নব্যতন্ত্রের যুবকও এখন পর্য্যন্তও জাতিভেদের উপর অসি-সঞ্চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে, যদি সকল প্রকারের উচ্চনীচত্বই অমঙ্গলকর বলেন, তাহা হইলে কোন কথাই নাই, কিন্তু কেবলমাত্র আভিজাতিক গৌরবকেই অমঙ্গলের নিদানীভূত মনে করা সূক্ষ্ম বিবেচনার কর্ম্ম নহে। ধনে, জ্ঞানে, বাহুবলে সমান হইলেও একজন ব্রাহ্মণতনয় একজন শূদ্র সন্তান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কথা যিনি স্বীকার করেন না, তিনি অন্ধ বা সংসার হইতে নির্লিপ্ত।

অনেকে এখন আভিজাতিক গৌরব-চিহ্ন শরীরে ধারণ করিতে অধর্ম্ম বিবেচনায় কুণ্ঠিত হয়েন। ইঁহাদিগের মহত্ত্ব আমরা আংশিক উপলব্ধি করিতে পারিলেও এই বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি নাই। যদি একজন আপনার বিদ্যার পরিচয় প্রদানার্থ আপনার নামের

পার্শ্বে B. A. বা M. A. লিখিতে পারেন, তবে তিনিই আবার আপনার আভিজাতিক গৌরব প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন তাহা আমরা বুঝি না।

বর্ত্তমান সময়ে আভিজাতিক নিদর্শনার উপকারিতা স্বীকার করিলেও, কোনরূপ উচ্চনীচতা যে সংসারে অচ্ছেদ্য আবরণাবদ্ধ হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছা নহে। মনে করুন, ধন-বিভেদ সম্বন্ধে যদি এরূপ নিয়ম হয়, যে কৃষকে পাঁচ শত মুদ্রার অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবে না, বা বিদ্যার তারতম্য রক্ষার্থ যদি এরূপ নিয়ম হয়, যে কৃষকসন্তান কাম্বেলি পাঠশালায় পঠিতবিদ্যার অধিক শিক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ঐ সকল নিয়ম আমাদিগের কখনই অনুমোদনীয় নহে। যে কাল হইতে আর্য্যজাতির বর্ণচতুষ্টয় মধ্যে অনুলোম ও বিলোম বিবাহ রহিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আভিজাতিক গৌরব চিরদিনের জন্য সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এটি অমঙ্গলকর। আভিজাতিক গৌরব সমাজমধ্যে থাকুক, অথচ যাহাতে অধস্তন শ্রেণীর জাতি আপনার সন্তান পরম্পরার আভিজাতিক মর্য্যাদা উন্নত করিতে পারে, তাহার পথ রাখিয়া

দাও। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার কতকটা সুবিধা ছিল, কলিযুগে সে পথ রুদ্ধ হয়, আবার বাঙ্গালায় সেন রাজত্ব সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি হওয়াতে জাতিভেদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে।

সংখ্যার দাসত্ব।

ইংরেজি চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে অনেকগুলি ইংরেজি প্রথা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে; তাহার কতকগুলি ভাল, আর অনেক গুলি এ দেশের উপযোগী নয়, আর কতকগুলি একেবারে সভ্যতার অনুমোদনীয় নহে। আবার কতকতগুলি এরূপ আছে, যে সেগুলি সকল দেশেই কোন না কোন ভাবে প্রচলিত থাকে, আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় রীতি নীতি দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সেগুলি আংশিক দূষণীয় হইলেও, সভ্যতাসূচক বলিয়া সর্ব্বত্র ক্রমেই সমাদৃত হইতেছে। যাহাতে এগুলি ক্রমেই সমাজে অধিকতর প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, এরূপ চেষ্টাকরা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সকল রীতি নীতি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া শীঘ্র ত্যজ্য নহে; তাহাতে আবার বিদেশীয় সভ্যতার পরিচ্ছদে আবৃত বলিয়া একটু আদৃত হয়,সুতরাং এগুলি হইতে সাবধানে সমাজ সংরক্ষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

এখনকার কৃতবিদ্য যুবক, ভূস্বামীর ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখিতে পারেন না, মহাজনের ধনবৃদ্ধি ভাল বাসেন না, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে চান না, উপাধিধারী-গণকে উপহাস করেন; ফল কথা এখনকার কৃত-বিদ্যের সমীপে, ধনগৌরব, মানগৌরব, বলগৌরব, জাতিগৌরব কিছুই নাই; অথচ কেবল সংখ্যা গৌরবের নিকট তাঁহারাই আবার অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হন। চিরকাল যে দাসত্ব করিয়াছে, দাসত্ব এত শীঘ্র সে বিস্মৃত হইতে পারে না; বাঙ্গালার যেখানে যত সভা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দেখিবেন, একই নিয়ম,—অধিকতর সংখ্যক সভ্যের মত হইলে অল্পতর সংখ্যক সভ্য তাহাদের দাসত্ব করিবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে কখনও কাহাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে শুনিয়াছেন? কখন না। আপত্তি করা দূরে থাকুক অনেকে মনে করেন, যে ঐ নিয়মটিই বুঝি সাধারণতন্ত্র প্রথার মূল মন্ত্র।

ঐরূপ নিয়ম থাকাতে, সভায়, সমাজে সর্ব্বত্র কিরূপ বিপরীত ফলোৎপত্তি হইতেছে, তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাই। মনে

করুন, কোন সভাতে তর্ক উঠিল যে, আমোদার্থ প্রতিনিয়ত সুরাপান করা কর্ত্তব্য কি না ;—অমনি ইংরেজী প্রথা মত 'বোট' লওয়া হইল ; অনেকগুলি শৌণ্ডিকালয়ের উৎসাহদাতা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ কর্ত্তব্য'। আর তুমি আমি সংখ্যার পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া গৃহে আসিলাম।

সেই জন্য বলি বাঙ্গালি এখনও দাসত্ব ভুলিতে পারে নাই, কেহ ধনের দাসত্ব করে, কেহ মানের দাসত্ব করে, কেহ বর্ণের দাসত্ব করে, কেহ বাহু-বলের দাসত্ব করে, আর এই দুর্ভাগা ইংরেজী-নবীশ সভাস্থলে স্পর্দ্ধা-সহকারে সংখ্যার দাসত্ব করেন।

এখন পুরাতন সম্প্রদায় কৃতবিদ্যগণকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, তোমরা যদি সংখ্যার দাসত্ব করিয়া আপনা আপনি গৌরব করিতে পার, তবে আমিও সমাজে সেই সংখ্যার দাসত্ব করিয়া কেন তোমার কাছে উপহসনীয় হইব ? আমরা বলি, বিধবা বিবাহ চলিবে না, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক নাই,—বাল্য-বিবাহ ভাল,—দাশরথি অদ্বিতীয় কবি,—গোময় পবিত্র সামগ্রী,—খেঁউড়ের চেয়ে আর গান নাই ;—যদি স্বীকার না কর, তবে সমা-

জের মত গ্রহণ কর; দেখ আমাদের দিকে পাঁচ কোটী পাঁচানব্বই লক্ষ পাঁচানব্বই হাজার হস্ত উঠিয়াছে তোমাদের পাঁচ হাজারে আর কি করিবে? তোমার 'বামাবোধিনী' ভস্ম কর, আমার 'কামিনী-কুমার' ক্রয় কর; তোমার 'জাতীয় সঙ্গীত' ভুলিয়া যাও, আমার সেই খেঁউড় শুনিবে আইস; পবিত্র গোময় সেবন কর; তুমি সভাস্থলে সংখ্যার দাসানুদাস, সমাজেও তোমাকে সেইরূপে থাকিতে হইবে। আমরা জানি না, পুরাতন সম্প্রদায় এইরূপ করিয়া আহ্বান করিলে, ইংরাজী-নবীশ তাহার কি উত্তর দিবেন।

বাস্তবিক যাঁহারা হাসিতে হাসিতে সংখ্যার দাসত্ব করিতে পারেন, তাঁহাদের মনস্বিতা নিশ্চয়ই নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে; অথবা বৈদেশিক সভ্যতাতে তাঁহাদিগকেএত দূর অভিভূত করিয়াছে, যে তাঁহারা এরূপ কঠোর দাসত্বকে আর দাসত্ব বোধ করিতে পারেন না।

অহঙ্কার।

কোন মনুষ্যের যদি অহঙ্কার না থাকে, তবে সে নিতান্ত অপদার্থ জীব। ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, অহঙ্কার না থাকিলে কিছুই কিছু নহে এবং কিছুতেই কিছু হয় না। আপনার প্রতি আপনার বিশ্বাস না থাকিলে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, উৎসাহ থাকে না, প্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং ক্রমে কার্য্যকারিতা-শক্তিরও হ্রাস হয়। দম্ভের নাম অহঙ্কার নহে; দম্ভ সর্ব্বদাই ত্যজ্য, অহঙ্কার আরাধ্য বস্তু। ধার্ম্মিক বলিয়া যে আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, সে প্রায়ই নির্ব্বোধ অথবা কুলোক; কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া যাঁহার মনে মনে আপনার কাছে আপনার অহঙ্কার আছে, তিনি অনেক সময়ে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত নীতির লোক। আমাদের দেশের লোকের মনোমধ্যে যদি প্রকৃত অহঙ্কারের অধিকতর পরিব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে দেশমধ্যে এত কুনীতি, কুক্রিয়া কখনই থাকে না।

সামাজিক রীতি নীতির কোন কোন বিষয়ে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার বাত বলে, ঠিক বিপরীত

পথে যাইতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল, যে, প্রকৃত রাশি-ভারি লোক সমাজে মান্য গণ্য হইতেন; এখন অৰ্দ্ধ শিক্ষিতগণের সভ্যতার গুণে তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করা প্রথা হইয়াছে; আর যে অপদার্থ পলিত-কেশ জীব তিন পুরুষের সহিত একত্র বসিয়া মদ খাইয়াছে, তাহার 'অমায়িকতার' প্রশংসাই বা কত! আপাতত দেখিলে, বোধ হয়, বুঝি এই ভূলোক, কালে "ইয়ার লোকে" পরিণত হইবে। কিন্তু সকলের মনে যদি যথোপযোগী অহঙ্কার থাকে, তাহা হইলে, কখন এরূপ হয় না। মনুষ্যজীবনের প্রথম শিক্ষা অহঙ্কার, আত্মগৌরব, আপনার উপর শ্রদ্ধা, আপনার উপর বিশ্বাস। কুসংসর্গে লোক মন্দ হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার মনে নিয়মিত অহঙ্কার নাই, সেই উচ্ছিন্ন যায়। অনেককেই এইরূপ 'অমায়িক' তর্ক করিতে দেখা গিয়াছে, "আমরা অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ, সামান্য মনুষ্য; কোন্ কীটাণুকীট, আমাদের আবার ধৰ্ম্মই বা কি? আর কৰ্ম্মই বা কি? আমাদের আবার দৃষ্টান্তই বা কি, আর তাহার ফলাফলই বা কি?" কিন্তু বাস্তবিক আমরা তত ক্ষুদ্র জীব

নহি। আমরা গৌতম, অরিষ্টটল, কোম্তের কুটুম্ব—এইরূপ অস্থি মজ্জা হইতেই বেদ,বাইবল্, রামায়ণ মহাভারত নিঃসৃত হইয়াছে,—এইরূপ দ্বিহস্তপদ বিশিষ্ট জীবই দূরস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদির সংক্রমণ, নিষ্ক্রমণাদি, হস্তামলকবৎ অভ্রান্তরূপে দর্শন করিতেছেন! আমাদের বুদ্ধি পরিমিত বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা বিশ্বমণ্ডলের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি; হৃদয় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই হৃদয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু পর্য্যন্ত কোটি কোটি জীবের প্রত্যেকটিকে ভাল বাসিতে পারি, তবে কেন এ হেন মানবজন্মের গরিমা বিস্মৃত হইয়া, মস্তিষ্কের চালনা করিব না, বা হৃদয়ে তেজ ধারণ করিব না? ধর্ম্মের যে ভিত্তি, কর্ম্মের যে মূল, তাহার নাম, অহঙ্কার; এ অহঙ্কার আরাধ্য বস্তু; দম্ভ এবং দাম্ভিক হইতে দূরে বিচরণ করিব বটে, কিন্তু অহঙ্কার নারীর সতীত্বের মত সযত্নে রক্ষা করিব।

শিক্ষিত, অশিক্ষিতে প্রার্থক্য।

দেশ-হিতৈষিতা বলুন, আর ভ্রাতৃ-ভাবই বলুন, জাতীয় ভাব বলুন, অথবা প্রকৃত উদারতাই বলুন, যে নামেই এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে অভিহিত করুন, প্রবলরূপে হৃদয় মধ্যে ঐরূপ একটি ধর্ম্মভাব জীবন্ত না থাকিলে, বিদ্যা, ধন, বল, বুদ্ধি, এ সকলে কোন ফল দর্শে না। আমরা প্রত্যহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া থাকি। একটি বলিব ; এখনকার নূতন কৃতবিদ্য সম্প্রদায়, সাধারণ অশিক্ষিত-জন-পুঞ্জের প্রতি ক্রমেই অধিকতর ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছেন। হৃদয়মধ্যে প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতার অভাব অর্থাৎ হৃদয়ের ক্ষুদ্র আয়তনই অনেক পরিমাণে ইহার কারণ।

পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ব্বে দেশমধ্যে আর এক প্রকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন ; সেই সম্প্রদায়ের অর্থাগমের ক্রমেই হ্রাস হওয়াতে তাঁহারা দিন দিন লোপ পাইতেছেন। পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রতি গণ্ডগ্রামেই ন্যায় স্মৃতিতে সুপণ্ডিত দুই একজন অধ্যাপক ছিলেন, এবং প্রায়ই পাঁচ সাতটি করিয়া তাঁহাদের সুপণ্ডিত ছাত্র থাকিত। তাঁহারাই

তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন; তাঁহারা কি এখনকার ইংরেজি-নবীশগণের মত জনসাধারণকে এইরূপ ঘৃণা করিতেন? বোধ হয়, না। সাধারণ জনমণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণকে আপনারা অবশ্য রামায়ণ গান বা মহাভারত কথন শুনিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা ইংরেজি-নবীশ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছেন,—কখন দেখিয়াছেন কি? না, অসাধারণী ঘৃণা তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সহিত বসিতে দেয় না। ইংরাজি-নবীশ আপনার অশিক্ষিত স্বজাতি বৃন্দকে কৃমিবৎ ঘৃণা করেন। স্বজাতির বিশেষণ প্রদান অবসরে তাঁহারা 'পশুগুলা"— এই কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আরও দুঃখের কথা বলি; অপরিষ্কার অশিক্ষিত গরীব দুঃখী প্রতিবাসীর ব্যারাম হইলে, এখনকার ইংরেজি-নবীশত্বের অহঙ্কারীগণকে কখন তাহাদের কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভাল মন্দ তথ্য লইতে শুনিয়াছেন? নিরন্নের পর্ণকুটীরে তাঁহারা কখন পদার্পণ করেন না। হা দুরদৃষ্ট! এইরূপে কি ভারতে একতা জন্মিবে ও তুমি জন্মাইবে? তুমি যদি

একদিকে ইংরেজি ভাষার আশ্রয় লইয়া, ইংরেজ শাসনের নিন্দা করিয়া মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, বাঙ্গালা, এক নৈতিক সূত্রে আবদ্ধ করিবে, আর অন্য দিকে সেই ইংরেজির অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জাতীয়ত্বের জীর্ণ গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত ছিন্ন করিবে, তবে কাজে কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, তোমার মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় নাই; বিদ্যা আছে, বুদ্ধি নাই।

শিক্ষিত, অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্যের দিন দিন বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা ক্রমেই ভীত হইতেছি। এক দেশবাসীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, ইহা সকল সময়েই দুঃখের কথা; আবার যদি পণ্ডিতসম্প্রদায় সাধারণকে ঘৃণা করেন, তবে তাহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর নাই। তুমি লেখাপড়া শিখিয়া যদি নিয়তই অশিক্ষিতের সঙ্গ কৃমিবৎ পরিত্যাগ করিবে, তবে তাহাদিগের সৎসঙ্গ শিক্ষা লাভ কিরূপে হইবে? তাহাদের রুচি পরিবর্ত্তন কিরূপে হইবে? এবং উন্নতিই বা কিরূপে হইবে?

কোন্‌টি নিকটে, কোন্‌টি দূরে,—স্থির করা আবশ্যক।

এখনকার কালে আমরা যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি, বাস্তবিক সেগুলি এখন আমাদের হিতসাধক কি না, অনেক সময় তাহা স্থির করিবার অবকাশ পাই না, আর অনেক সময় এরূপ সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। সত্যসত্যই এখন আমাদের কোন্‌ বিষয়টির অভাব হইয়াছে, আর কোন্‌টিতেই বা হুজুকে পড়িয়া আমরা অভাব হওয়া বলিয়া বোধ করিতেছি, তাহা স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং কোন সামগ্রীই বা কি পরিমাণে কাহার প্রয়োজনীয় তাহাও জানা চাই।

যিনি প্রয়োজনীয় পদার্থের পাত্রাপাত্র, সময় অসময়, এবং পরিমাণাদি বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সমাজতত্ত্ববিৎ। ইংলণ্ডে আন্দোলন, ভারতবর্ষে পার্লিয়ামেণ্ট, সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,-বিধবা, সধবা, বহু-ধবা, সকলেরই একরূপ বিবাহ-

শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চা, ব্যায়ামের অনুশীলন, সংবাদ-পত্রের বিস্তার প্রভৃতি নানারূপ পদার্থের সমান অভাব বোধে যাঁহারা সর্ব্বদা চীৎকার করেন—তাঁহারা প্রকৃত সমাজতত্ত্ববিৎ নহেন।

মোগল রাজত্বের অবনতির সময় হইতে ভারতবর্ষ ক্রমেই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, চৈতন্য দেব যে সকল সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ করিয়া যান,তদীয় উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে, সে সকল ক্রমেই কুসংস্কারে পরিণত হইয়া আসিয়াছে ; ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, যে এখন তাহা মনে করিতে গেলেও হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। বিলাতীয় ঐন্দ্রজালিকগণ আমাদের মত শিশুসংগ্রহের সম্মুখস্থ তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের আবরণ ভিত্তি অকস্মাৎ অপসারিত করিয়া দিতেছেন ; দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে দেখিবার আমাদের না আছে ক্ষমতা,—না আছে, সুযোগ ; কেবল এক দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ সেই সুরঞ্জিত দৃশ্য দেখিতেছি ; চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে ; দূরত্ব বোধ করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি ; দূরস্থ পর্ব্বতের বৃক্ষলতা সকল গুলিই যেমন সমান নিকটে

বোধ হয়, এবং বালকে যেমন তাহা পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই হস্তপ্রসারণ করিতে থাকে, আমরাও সেইরূপ সর্ব্বদাই হাত বাড়াইতেছি; তা—কি নিউটনের বিজ্ঞান, কোম্‌তের দর্শন, রুষোর সাম্য-তত্ত্ব, নেপোলিয়নের সমরকৌশল,—আর কি বেন্থামের ব্যবহার নীতি, মিলের সমাজতত্ত্ব, ডার্বিনের পরিণাম-বাদ—সকলই আমাদের কাছে সমান নিকটে; সমান রঙ্গের, এবং সমান সুখ লভ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

আপনার এবং সজাতির, আত্মীয় এবং স্বজনের, সকলেরই এইরূপ অবস্থা,—কাজেই দুঃখ হয়; কিন্তু একবার কোনরূপে দুঃখবেগ থামাইয়া একটু পর ভাবে দূর হইতে দেখিতে পারিলে, এই অবস্থায় আমোদ করিবার বিস্তর উপকরণ আছে। পূর্ব্বে কোন আদার ব্যাপারী জাহাজের কথা জানিতে গেলে বড় উপহাসভাজন হইত, বধিরে সংগীত শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, অন্ধব্যক্তি জ্যোৎস্নালোকে হর্ষ ভাব জ্ঞাপন করিলে—উপহাসাস্পদ হইত; কিন্তু এখনকার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

সে যাহা হউক, এখন, সম্মুখস্থ বাঞ্ছনীয় পদার্থাবলীর মধ্যে কোনটি অপেক্ষা কোনটি অধিক সুলভ, কোনটি অগ্রে না পাইলে কোনটি পাওয়া যায় না, তাহা জানা না থাকাতে আমাদের মধ্যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এটি অনেকের মনেই উদয় হয় না, যে, যে সমাজে সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ জন আপন আপন স্ত্রী পুত্র পরিবারকে সুখ-সচ্ছন্দে রাখিতে পারে না, তাহারা অনবরত আসাম-বাসী কুলীগণের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কি করিবে? সকল বিষয়েরই ক্রমোন্নতি আছে; উন্নতি—অর্থে ক্ষণকালের জন্য লাফিয়া উঠা নহে; সেটি কেবল অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ। অনন্ত বিস্তৃত উন্নতির পথ, হিমালয় পর্ব্বতের মত ক্রমেই ঊর্দ্ধ বিস্তারিত রহিয়াছে; তাহার তলদেশ হইতে যত ঊর্দ্ধে যাইবে ক্রমেই গ্রাম, নগর দেখিতে পাইবে; ঐ চাকচিক্যশালী সাম্য-নগর দেখিয়া তুমি মনে করিতে পার, আমি এই সোজাপথে একেবারে ঐ খানে গিয়া উঠিব; কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই; যিনি পাহাড়ে উঠিয়াছেন, তিনিই জানেন, পাহাড়ের পথ, কিরূপ আঁকা

বাঁকা; চারি ক্রোশ ঘুরিয়া সাত হাত ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়। বীরবংশ ফরাশিস্‌ তনয়কে ঐ সাম্য-নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, রুষো, বল্টেয়ার, ফুরিয়ার, সাইমন প্রভৃতি সাথীগণ কত সহজ পথ দেখাইল; রবস্‌পিয়র হইতে নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত কত মহা-পুরুষ, ফরাসি জাতিকে স্কন্ধে করিয়া কত রক্তের নদী পার করাইল; দেখ ফরাসিস্‌ জাতি পথ পাই-য়াও এখনও কত দূরে রহিয়াছে, আর কূপোদক-বাসী বঙ্গ সন্তান বিলাতীয় ঐন্দ্রজালিকগণের কাচ যন্ত্রে সেই সাম্যের ছায়া দেখিয়া তাহা নিকটস্থ বোধে পাইবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। দেখিলে —হাসিও আসে, কান্নাও পায়।

কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পিছে তাহা আমাদের কিছুতেই বোধ হইতেছে না। যাহাতে সমাজের মধ্যে অন্তত কতকগুলি লোক সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহার চেষ্টা অগ্রে করা উচিত? না, সে কথা ফেলিয়া রাখিয়া সূর্য্যের পৃষ্ঠের চপেটাঘাত চিহ্নের পরিবর্ত্তনের সহিত বাদল বাত্যার কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাই ভাবা উচিত? ইহার কি মীমাংসা হয় না? অনেককে এই বিষয়ে অতি

গম্ভীরভাবে উত্তর দিতে দেখিয়াছি—যে, "সকল বিষয়েই একটু একটু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" এই কথাই যদি ঠিক হয়, তবে বাপের শ্রাদ্ধের দিন লোকে সেতারের গৎ বাজাইতে শিখুক, আর মৃত্যু শয্যায় শায়িত পুত্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করুক। না,—সেরূপ হওয়া কখনই অভিলষণীয় নহে। প্রয়োজনীয় পদার্থ পাইবার চেষ্টা করিবার সময় অসময় আছে; একটির পর আর একটি—এইরূপ সোপানের মত তাহার ক্রম আছে।

দেশ মধ্যে যাঁহারা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক আছেন,—কোন্ কোন্ বিষয়ের উন্নতি সাধন পক্ষে তাঁহাদের অগ্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে যদি স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হয়, আমরা মনে করি।

কৃপণ।

ভয় বা শোকের সময় মনের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ বিকৃত অবস্থার সহিত বাতুলের মনের অবস্থার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কেবল ভীত বা শোকার্ত্তের মনের ভাব ক্ষণিক, বাতুলের চির-স্থায়ী। হঠাৎ ভয় পাইলে লোকে যেমন আলো-আঁধারের ছায়ায় বিভীষিকা দেখে,শোকে অভিভূত হইলে লোকে যেমন আপনার সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি একেবারে উদাসীন হয়, বায়ু-রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি নিয়তই অথবা অধিকাংশ সময়েই সেইরূপ থাকে। সুতরাং ভীত, শোকার্ত্ত, ক্রোধিত বা কাম-মোহিত ব্যক্তি—ক্ষণিক বাতুল মাত্র। কৃপণ-স্বভাব ব্যক্তি অর্দ্ধ বাতুল; ক্ষণিক বাতুল নহে, চিরদিন সমানে—অর্দ্ধ বাতুল। বাতুল বা শোকার্ত্ত প্রভৃতির ক্ষুৎপিপাসাদির নিয়ম নাই, মনের ভাবও যেরূপ বিকৃত, শরীরের ভাবও সেইরূপ বিকৃত; কিন্তু কৃপণের প্রায় সেরূপ শারীরিক বিকার নাই। তাহার মনের একটা ভাগ একেবারে সম্পূর্ণ বিকৃত। বাতুল যেমন তিলকে তাল জ্ঞান করে, কৃপণ

ব্যক্তি তেমনই চিরদিনই একটি পয়সাকে শত মুদ্রার মত বোধ করে। মনে করুন,—পুত্রের বিবাহ বাসরে, বৈবাহিক-অঙ্গনের পূরা আসরে, কৃপণের একটি পয়সা পড়িয়া গড়াইয়া গেল, ধাতু-পূজক সেই পয়সাটির জন্য সেই মজলিসের তাবৎ লোককে উঠাইবে, বৈবাহিকের চাকর নফরকে ডাক হাঁক করিয়া আনাইয়া সমস্ত বিছানা তুলাইবে, সমস্ত উঠান ঝাঁট দেওয়াইবে। মনে করুন, আর বাতুল কাহাকে বলে? কৃপণ কেবল অৰ্দ্ধ বাতুল নহে; কৃপণ অপরার্দ্ধে পাপী। কৃপণ প্রতিনিয়তই দরিদ্রের অন্ন সমাগম-সুযোগে ব্যাঘাত দিয়া পাপের ভাগী হইতেছে। লৌহ কোষের নিকটে দাঁড়াইয়া নিভৃতে সন্তর্পণে কৃপণ যে ধন গণনা করে, তাহা যদি সেই নির্ব্বোধ কোন ব্যবসায়ে নিয়োগ করে, তবে মনে করুন, কত শত লোক তাহাতে অনায়াসে অন্ন সংস্থান করিতে পারে। সে কখনই তাহা করিবে না, নীচ উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়া "দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ মুক্তিঃ" এই বিবেচনায় আপনার ইষ্ট দেবতার মত ধনকে চির-দিন কোষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে সেও স্বীকার,

তথাপি জগতের হিতের নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও বাহির করিবে না। এই জন্য সমগ্র পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল জাতিই কৃপণকে ঘৃণা করে; বেচারারা প্রায়ই কখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও মন্দ করিতে অগ্রসর হয় না, অথচ সকল সমাজই—প্রবঞ্চনাকারী, মিথ্যাবাদী, লম্পট-স্বভাব মানব অপেক্ষা ধাতু-পূজক কৃপণকে অধিকতর ঘৃণা করিয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্য সমাজের এরূপ প্রবৃত্তি মানব প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তার এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক। তুমি স্বভাব দোষে অর্দ্ধ বাতুল এবং তোমার বুদ্ধির দোষে তুমি অর্থরাশি অযথা সঞ্চিত করত, সাধারণ লোককে বঞ্চিত করিয়া পাপ করিতেছ, তোমাকে সমাজ ঘৃণা করিবে বৈ আর কি করিবে? আর তুমি লক্ষপতি হইলেও সকলের ঘৃণার পাত্র, তুমি যে তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সমশ্রেণীর লোকের নিন্দা শুনিয়াও কৃপণতা কর, সেটি তোমার বাতুলতার পরিচায়ক মাত্র।

দৃঢ়তর মুষ্টেঃ সতত কোষ-নিবদ্ধস্য সহজ মলিনস্য,
কৃপণস্য কৃপাণস্যচ কেবল মাকারতো ভেদঃ।

একজন কবি কৃপণের সহিত কৃপাণের (খড়্গের)

তুলনা করিয়াছেন; উভয়েরই বজ্রমুষ্টি, উভয়েই সর্ব্বদা কোষমধ্যে থাকে, একটু শ্বাস পতনে উভয়েই মলিন হইয়া উঠে,—তবে কৃপণ আর কৃপাণে কেবল এক আকারের ভেদ আছে। আমরা বলি আরও সাদৃশ্য আছে—উভয়েই রুধিরের লোভে গলা কাটিতে পারে।—এরূপ বায়ুরোগ-গ্রস্ত, নীচ, এবং নৃশংস জীবকে সমাজে যে ঘৃণা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কৃপণ নানা প্রকার প্রকৃতির। কেহ লক্ষপতি হইয়াও যাবজ্জীবন মহাপ্রাণীটাকে দারুণ কষ্ট দেয়। মোটা ভাত, মুড়ি জলপান, খেটে কাপড়, আর দিনের মধ্যে হেঁটে দশ ক্রোশ পথ চলা ইত্যাদিতে তাহার আত্মা বৃথা কষ্ট পায় মাত্র। তবে ইহাতে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি নাই, সুতরাং কৃপণের কষ্ট দেখিয়া কেবল দুঃখই হয়। যে পরের উপকার জন্য ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করে,—সে মহাপুরুষ, মহাপুণ্যশালী। যে কেবল ধন সঞ্চয়ের জন্য ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করে—সে কৃপণ, অর্দ্ধ বাতুল; আবার সেই কৃপণ যখন আপনার পোষ্য পরিবারবর্গকে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট দেয়,

তখন সে—মহাপাপী। এমনও মহাপাপীর কথা শুনিয়াছি, যে তাহার বাটীর পুরস্ত্রীগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া কুলপরিত্যাগিনী হওত নিরয়ে বাস করিতেছে। এমন লোক সংসারে বিরল, তাই রক্ষা। নহিলে এ সংসারকে নিরয়-রাজ্য বলিতে হইত, দেবতার রাজ্য বলিতাম না; কিন্তু প্রচুর ধন থাকিতে পরিবারগণকে অন্নাচ্ছাদনের কষ্ট দিত, এমন মহাপাপী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিস্তর ছিল। দশ পাঁচখানি গ্রামের মধ্যে এমন এক একজন লোক বাস করিত, যে কেহই প্রাতঃকালে তাহাদের নাম করিত না। ইংরেজি শিক্ষার তাড়নাতেই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে।

আর এক প্রকার কৃপণ আছে, তাহারা আপনারা সপরিবারে খায় পরে ভাল, কিন্তু কখন প্রাণ ধরিয়া হাত তুলে গরীব দুঃখীকে আধ পয়সা দিতে পারে না। অভাগারা এমন মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া দানের সুখ কখন উপভোগ করিতে পাইল না। যে দেখিবে টুকি টাকি ভাল মন্দ জিনিশটী কেনে,

কিন্তু চিরকাল বলিয়া বেড়ায়, যে সকল বস্তুই সে চড়া দরে কিনিয়াছে, সেই জানিবে এই শ্রেণীর কৃপণ। ক্বচিৎ কোন কার্য্যক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষার্থ এই শ্রেণীর লোকের কাছে উপস্থিত হইলে, তাহাকে অর্থনীতির উপদেশ দিয়া খাটিয়া খাইতে বলে, আবার কোন অসমর্থ লোক ভিক্ষার্থী হইলে আপনার মন্দ অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া তাহাকে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অতিথিশালায় যাইতে অনুরোধ করে—কখন কাহাকেও একমুষ্টি তণ্ডুলকণা দেয় না। ইংরেজি নীতির দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক, এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

ভারত মধ্যে বৈষম্যের অন্তরে সাম্য আছে।

ভারতবর্ষ একটী স্বতন্ত্র রাজ্য তাহা চিরদিনই প্রসিদ্ধ, উপভাষার বাহুল্যে অথবা উপচ্ছদের বিভিন্নতায় ভারতের একতার হানি হয় নাই। ঈদৃশ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে যে উপভাষার বিভিন্নতা হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ যে এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য মধ্যে একটি মাত্র রাজ-নৈতিক ভাষা প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। সর্ব্বত্রই রাজসভায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, রাজকার্য্য সংস্কৃতভাষাতে হইত; এক রাজা অন্য রাজার সমীপে সংস্কৃত ভাষায় লিপি লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন; কোন ব্যবহার গত বিবাদের মীমাংসা করিতে হইলে, সংস্কৃত ভাষাতেই তাহার আলোচনা হইত। পরিচ্ছদের নানা বিভিন্নতা থাকিলেও রাজসভায় সর্ব্বত্রই সকলে একরূপ বসন ব্যবহার করিতেন। পাদুকা, ধুতি, অঙ্গ-চ্ছদ, উত্তরীয়, উষ্ণীষ। অঙ্গ,

বঙ্গ, কলিঙ্গ, মথুরা, দ্রাবিড়—সর্ব্বত্রই সমান। সুতরাং উপভাষা বা উপচ্ছদের ভিন্নতায় ভারতবর্ষের একতার হানি হয় নাই।

আমার দেহচর্ম্ম—বিস্তৃত ও শ্যামবর্ণ; নখররাজি—শুভ্র অথচ ক্ষুদ্র; কেশকলাপ—সূত্রবৎ এবং ঘোর নিবিড় কৃষ্ণ, ওষ্ঠাধর—মাংসল,আরক্ত; —অতএব এ সকল মধ্যে আকারে প্রকারে যখন এত বিভেদ তখন সমস্ত শরীরকে এক দেহ বলা বাতুলতা মাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে; কেন না যখন অঙ্গুলির অগ্রভাগে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, মস্তকে পীড়া জন্মে, যখন ওষ্ঠে ব্রণ হইলে সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়, তখন আমার দেহের অবয়ব সমস্ত আকৃতি প্রকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও একই দেহের অবয়ব। সকল অবয়বের মধ্যে একটী এক-প্রাণতা আছে।

এক-প্রাণতা থাকিলে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে একটী দেশ বলিব, আর এক প্রাণতা না থাকিলে একটী নরদম্পতিও দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্বাভাবিক সমষ্টি বলি। ভারতে কি এক-প্রাণতা ছিল না? ছিল; এখনও আছে। তবে কখনও বেশী; কখনও

কম। ভারতের প্রাণ এক, হৃদয় এক; তবে যখন জীবনে জীবনী থাকে, হৃদয়ে প্রচুর শোণিত থাকে, তখনই এক-প্রাণতা সহজে বুঝিতে পারা যায়; আর যখন হৃদয়ে বল নাই, দেহে রক্ত নাই, তখন এক-প্রাণ বটে, কিন্তু নির্জীব। যে রোগীর দেহে রক্ত নাই, তাহার অঙ্গুলিতে আঘাত করিলে হৃদয়ে ব্যথা লাগে না। ভারতেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, দেহে একটু বল হইলেই দেখিবে ভারত আবার এক-প্রাণে নাচিয়া উঠিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে যে একপ্রাণতা ছিল, এবং এখনও আছে, তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। একপ্রাণতা হইবারও প্রচুর কারণ আছে। সমগ্র ভারতবাসী, একই পৌরাণিক বীরবৃন্দের নামে মস্তক অবনত করিয়া থাকে, আর তাহাদিগকে আপনাদের সজাতীয় বলিয়া তাঁহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়। রামায়ণে, মহাভারতে, ভাগবতে ভারতের সকল প্রদেশের ছোট বড় সকলের সমান আস্থা এবং অধিকার আছে। সীতা কেবল ইতিহাসের হইলে, মৈথিল বা অযোধ্যাবাসীর স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইতেন; কিন্তু সীতা আমাদের পৌরাণিকী

দেবী সুতরাং ভারতবাসী মাত্রেরই আরাধ্যা বস্তু, সকলেরই কলত্র কন্যার আদর্শ স্থানীয়া। লুক্রিশিয়ার সহিত আমাদের সে সম্বন্ধ নাই। লুক্রিশিয়া আমাদের কেহ নহেন; সীতা, আমাদের রামায়ণের—আমাদের সীতা। সেইরূপ ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র,—সাবিত্রী ও দময়ন্তী আমাদের। ইহাতেই ভারতের একপ্রাণতা অছে বলি।

ভারতে কেবল কাব্য পুরাণ এক নহে। একই ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত। দেব, গুরু, দরিদ্রে দান, অতিথির সেবা, পিতৃপুরুষের তর্পণ, অনার্ত্তবা কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান, ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিষ্ট বলিয়া কোথায় গণ্য নহে? কোথায় মহাত্মা মনুর সম্মান নাই?

পুরাণ এক, কাব্য এক, ধর্ম্মশাস্ত্র এক, ন্যায় দর্শনও এক। যিনি সহস্র বৎসর মধ্যে কখন বোম্বাইবাসী ও বাঙ্গালি মধ্যে আলাপ হয় নাই এই কথা শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত, ইহা নিশ্চয় যে তিনি কখন নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর কথা শুনেন নাই। ত্রৈলঙ্গ, মারহাট্টা, কাশ্মীর, বিক্রমপুর—দিগ্দেশের ছাত্র এক চতুষ্পাঠীতে ক্রমাগত দশ

বৎসর কাল থাকিয়া এক অধ্যাপকের কাছে, এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, বঙ্গীয় পণ্ডিত-কুল-শিরোমণি শিরোমণির বুদ্ধির কাছে মস্তক নত করে; তাহাতে যে এক-প্রাণতা জন্মে, তাহা সভ্যতম আমেরিকাবাসীরও আদরের সামগ্রী। এই এক-প্রাণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেব লীলাচল হইতে ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তরঙ্গ তুলিতে পারিয়াছিলেন; এখনও একপ্রাণতা আছে বলিয়াই দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতের সর্ব্বত্র ঋষিতুল্য সমাদর প্রাপ্ত হন; সেই জন্যই বরদা রাজ গুহকুমারের দুর্দ্দশাতে দ্বিশত যোজন দূরবর্ত্তী অজ্ঞ বঙ্গবাসী তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়াছে, আর সেই জন্যই, কোথায় সুরাট—সেখানকার কি কাগজের কে দুই জন সম্পাদককে অন্যায় করিয়া পুলিসের লোকে হাতকড়ি দিয়া যন্ত্রণা দিয়াছে, অপমান করিয়াছে, শুনিয়া, সহৃদয় বঙ্গবাসী বিষণ্ণ হয়।

এক-প্রাণতা ভারতে চিরদিনই আছে, তবে পূর্ব্বের মত সজীবতা নাই।

সোণা রূপার কথা।

সকল দেশের সকল বিনিময়ের সামগ্রীরই দর প্রায় বাড়ে কমে; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কোন একটি সামগ্রীর বিনিময়ে আর একটি সামগ্রী যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা সকল সময়ে সমান থাকে না; বাড়ে কমে। এক মণ ধান দিয়া মনে করুন আজি আধ মণ গম পাওয়া গেল; বরাবরই যে ঐ আধ মণ পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়, ইহার পর অনেক দিন যে ঐ পরিমাণ থাকিবে তাহাও নহে; পৃথিবীর প্রায় সকল জিনিশেরই বিনিময়-ফলের কম বেশী আছে।

সকল সামগ্রীর বিষয়ে ঐ কথা না বলিয়া, প্রায় সকল সামগ্রী বলিতেছি, তাহার প্রধান কারণ এই যে, বহুকাল হইতে সোণা রূপা এ বিষয়ে নিয়ম বহির্ভূত ছিল। ঐ দুই ধাতুর বিনিময় ফল বহুদিন ধরিয়া সমানই ছিল; ১ ভরি সোণার বিনিময়ে ১৬ ভরি রূপা, অথবা ১৬ ভরি রূপার বদলে ১ ভরি সোণা,—এইরূপ অনেক কাল ছিল।

সোণা রূপা এই দুই ধাতু মধ্যে পরস্পর বাঁধি দর থাকাতে বিস্তর সুবিধা ছিল; স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য-মুদ্রা লইয়া কেনা-বেচা করিতে কোন গোল-যোগ হইত না।

নানা কারণে সোণা রূপার মধ্যে আর নির্দ্দিষ্ট দর নাই; এখন রূপা শস্তা হইয়াছে; এক ভরি সোণায় উনিশ ভরি রূপা। ইহাতে আমাদের দেশে নানারূপ ক্ষতি হইতেছে; বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

রূপা সোণা মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক কিসে নষ্ট হইল, তাহার গুটিকত কারণ বলা যাইতেছে।

দেশে ধনবৃদ্ধি হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও দেশমধ্যে প্রচলিত মুদ্রাসংখ্যা যে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। যে পল্লীগ্রামে লোকে কেবল লক্ষ্মীর হাঁড়িতে টাকার মুখ দেখিত, সেইখানে এখন দেখিবে, অভাবত পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রা ছড়ান আছে ইহাতে রূপার মুদ্রার ইজ্জৎ কমিয়াছে।

সোণার গহনা করিবার নিমিত্ত লোকে ব্যস্ত; সোণার উপর টান বাড়িতেছে; দেশমধ্যে সোণার

পরিমাণ বাড়িয়াছে; কিন্তু সোণার গৌরব কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে।

সোণা রূপার খনি দিন দিন নূতন নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে; রূপার খনির সংখ্যা অনেক হইয়াছে; সোণার অল্প। খনি হইতে সোণাও উঠিতেছে, রূপাও উঠিতেছে; পৃথিবী মধ্যে সোণা রূপার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে; রূপার পরিমাণ হুহু করিয়া বাড়িতেছে, সোণার পরিমাণ ধীরে ধীরে। সুতরাং সোণা রূপার মধ্যে যে বাঁধাবাঁধি যোলগুণ দর ছিল, তাহা টেকিবে কেন?

এই সকল কারণে ক্রমেই সোণা মহার্ঘ, আর রূপা শস্তা হইতেছিল, কিন্তু অতি অল্প-তর তফাৎ বলিয়া এতকাল কেহ বড় লক্ষ্য করে নাই।

দেশের মধ্যে সাধারণ লোকের অবস্থানুসারে, অধিক বা অল্প মূল্যের ধাতু মুদ্রা বা আর কোন দ্রব্য, বিনিময়-সাধনরূপে প্রচলিত থাকে; আমাদের দেশে পূর্ব্বে কড়িই মুদ্রার মত প্রচলিত ছিল; তখন কাহন কাহন কড়ির দেনা-লেনা করিয়া কেনা-বেচা হইত। ক্রমে পয়সা চলিল; সামান্য

জিনিসের দর লোক পয়সা বা আনার হিসাবে করিত; দশ বার আনায় ১ মণ চাল মিলিত; ক্রমে রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তখন 'বাঁধা সিকি' 'গোটা আধুলি'—তামাসা করিয়া বলিত; এখন আর তামাসা নাই, শস্যাদি অনেক জিনিসই টাকার হিসাবে দর করিতে হয়।

আমেরিকা, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যাদি দ্বারা প্রভূত ধন বৃদ্ধি হইয়াছে; এখন ঐ সকল দেশে মহাজনিতে, ব্যবসাদারিতে রূপার মুদ্রার হিসাব করাতে সুবিধা হয় না। আজি আট বৎসর হইল, ঐ উভয় দেশে রাজনিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, যে রাজস্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্বর্ণমুদ্রায় বা স্বর্ণ মুদ্রার হিসাবে আদান প্রদান হইবে। সেই অবধি রূপার বাজার মাটি হইল; রূপার হিসাবে সোণা দুর্ম্মূল্য হইল।

ইহাতে ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে পূর্ব্ব হইতে স্বর্ণমুদ্রাই ব্যবস্থা-সঙ্গত বলিয়া প্রচলিত ছিল, সে সকল দেশে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না; ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে রূপার টাকাই রাজস্বাদিতে গৃহীত এবং বেতনাদিতে প্রদত্ত হয়, সুতরাং সে

সকল দেশের সওদাগরগণের এবং রাজকর্ম্মচারীদের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে।

ঐরূপ কারণে প্রথম প্রথম সওদাগরদিগেরও অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা সতর্ক হইলেন; রূপা সস্তা হওয়ায় বাণিজ্যে যে পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা গণনা করিয়া তাঁহারা জিনিশের দরের উপর এক্সেচেঞ্জের বাট্টা চড়াইয়া দিলেন; তাহাতে খরিদার অর্থাৎ আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, শাসনাদি কার্য্য পর্য্যালোচনা জন্য বিলাতে একটি বৃহৎ সেরেস্তা আছে, অনেক কর্ম্মচারী আছেন; একদল রক্ষক সৈন্য ও অফিসর প্রভৃতিও আছেন; এই উভয় বিধ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আমাদের বিশেষ উপকার হয় বা না হয়, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাঁহাদের জন্য অর্থাৎ সদর সেরেস্তার সরঞ্জামি হিসাবে আমাদের প্রতিবর্ষে ১৬ কোটি টাকা দিতে হয়; এখন টাকা সস্তা, সুতরাং বাট্টা-শুদ্ধ—১৮ কোটিরও অধিক দিতে হয়; সালিয়ানা

এই ২ কোটি ২॥০ কোটি টাকা ভারতবর্ষের গর্ভ লোকসান।

দেশে যে দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, অস্বাভাবিক রূপে টাকা শস্তা হওয়া তাহার একটি প্রধান কারণ। একজন বিদেশী মহাজন ১০০ থান মোহর লইয়া, প্রথমেই রূপা খরিদ করিল; কলিকাতায় আসিয়া টেঁকশালে দিল, প্রায় ১৮৫০ টাকা পাইল; সেই টাকায় তণ্ডুল ক্রয় করিল; মনে করুন ৩৫০ মণ পাইল; পূর্ব্বের হিসাবে হইলে ১০০ থান মোহরে অর্থাৎ ১৬০০ টাকায় সেই দরে ৩০০ মণ পাইত মাত্র; সুতরাং রূপা শস্তা হওয়ায় রপ্তানি বেশী হইতেছে; যাহা হউক, যেনতেন প্রকারে আমরাই নানা দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।

ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিতেছি ?

আমাদের উৎসাহ বড় কম সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন হইলেই আমরা সহজে উত্তর দি, যে "আমরা ভবিষ্যতের জন্য কিছু করি, সে ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহাতে স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করা এক প্রকার অসম্ভব। দেবতায় বৃষ্টি হরণ করিবেন, পৃথিবী শস্য হরণ করিবেন, তাহার প্রতিবিধান করা আমাদের সাধ্যাতীত।" এ কথা কোন কাজের কথা নহে। আমরা নাকি নিতান্ত উৎসাহ-হীন জাতি, সুতরাং ঐরূপ উত্তর শুনিলেই সকলে অমনই বলিয়া থাকি, যে "হাঁ, তার সন্দেহ কি ?" —কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ও কথা কোন কাজের কথা নহে। স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া টেঁকিয়া থাকার নামই মনুষ্যত্ব। স্বভাব পেটের জ্বালা দিয়াছেন, সেই জ্বালা নিবারণের জন্য অন্ন সংস্থান করার নাম মনুষ্যত্ব। স্বভাব—বায়ু বৃষ্টি, ও বজ্র বর্ষণে আমাদের অবসন্ন করিয়া

ফেলেন,বাটী ঘর তৈয়ার করিয়া সেই কষ্ট নিবারণ করার নাম মনুষ্যত্ব। স্বভাবজাত নদ, নদী, হ্রদ, সাগর প্রভৃতি এক জাতিকে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল, মানব, পোত বহর বানাইয়া সেই সেই জাতির মেল করিতেছে; মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি করিতেছে। স্বভাবের রৌদ্রের বিরুদ্ধে মানুষের ছাতা; স্বভাবের গ্রীষ্মের বিপক্ষে মানুষের পাখা ইত্যাদি ছোট বড় সকল কাজেই দেখিবেন প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার হ্রাস করাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

আর, এই এক অন্নকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য কত দেশের লোকে কত কি করে এবং তদ্দ্বারা কতদূর মনুষ্যত্ব লাভ হয় দেখুন।

ইংলণ্ড যে এত বড় হইয়াছেন, এই সসাগরা ধরামণ্ডলের তিন ভাগের এক ভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, সেটা কেবল অন্নকষ্টের উত্তেজনায়। আজি তিন শত বৎসর হইতেছে,ব্যবসা ব্যবসা করিয়া ইংলণ্ডবাসীরা পৃথিবীর একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন; এবং সেই অবধিই ইংলণ্ড জগতে গণ্য

মান্যও হইয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যেরূপ উৎসাহশীল, তাঁহারা সেইরূপ উৎকৃষ্ট উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং সেইরূপ ফলও পাইতেছেন। আয়র্লাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকের তদ্রূপ উৎসাহ ছিল না, কাজেই ইংলণ্ডাধীন আয়র্লণ্ডবাসীরা এবং অন্যান্য দেশীয়েরা ইংলণ্ডীয়-দিগের সম্পূর্ণ সমকক্ষ হন নাই, তবে আর এক দিকে তাঁহারা বিলক্ষণ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া আমেরিকায় কৃষি অবলম্বন করেন; সেই কৃষিনিষ্ঠার শক্তি-তেই অন্নকষ্টে স্বদেশ হইতে তাড়িত ব্যক্তিগণের পৌত্রেরা এখনকার কালে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শুধু ইউরোপ বলিয়া নয়; আসিয়ার অধিবাসীগণও অন্নকষ্টে তাড়িত হইয়া বিশেষ বিশেষ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছে। মোগলদিগের আদি বাসস্থান তাতার দেশে অতি অল্প কারণেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। সুতরাং মোগলেরা পাকা ভিটায় স্থায়ী হইয়া বাস করিত না; যে মুলুকে শস্য দুষ্প্রাপ্য হইত, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সুলভ শস্যের অন্বেষণে বহির্গত

হইত। তাহাদের আগমনে পার্শ্ববর্ত্তি দেশের লোকের অন্ন সংস্থানে টান পড়িত, তাহারা সহজে ছাড়িবে কেন—কাজেই তাহাদের সহিত মোগলেরা যুদ্ধ করিত। ক্রমে উদারান্নের সংস্থান জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে মোগলেরা একদিকে দিল্লীশ্বরত্ব অন্য দিকে চীনেরআধিপত্য লাভ করেন; বর্ত্তমান চীনরাজ সেই মোগল বংশীয়।

চীনে যেরূপ লোক সংখ্যা, ঘন বসতি, তাহাতে, শ্রমদক্ষ চীনেমানেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া টেকিয়া রহিয়াছে তাই,—নতুবা চীনরাজ্যও এতদিন আমাদের মত অন্নকষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়িত। পৃথিবীর বাসযোগ্য ভূভাগের তের ভাগের এক ভাগে মাত্র, চীন রাজ্যের বিস্তার। এই তের ভাগের এক ভাগ ভূমিতে তিন ভাগের একভাগ লোকের বাস। প্রতি আবাদি বিঘায় চারি পোয়া ফসল হইলেও চীনের লোকদিগকে খাইতে কুলায় না। যদিও চীনামানদিগের ইউরোপীয় মিশ্র জাতিদিগের ন্যায় ঘোড়দৌড়ি রকমের সাহস নাই, কিন্তু চীনেরা বড় কৌশলী;—বড় ফিকিরবাজ। চীন দেশে এক টুক্‌রা গর-আবাদি জমি নাই; এমন বন

নাই, যে হিংস্র জন্তু বাস করিতে পারে। পেটের দায়ে চীনেরা সমস্ত তাড়াইয়াছে। পাহাড়ের উপর মাটি তুলিয়া নীচে হইতে কলসী করিয়া জল লইয়া গিয়া আবাদ করে। জলকর আবাদ করিতেও ছাড়ে নাই। চীনদেশের সমস্ত বিলে, বাঁধে—আবাদ হয়; আবার জলের ভিতর মৎস্যাদি যেমন থাকে তাতো আছেই। তাহা ছাড়া জল-মধ্যে এক প্রকার মোটা ধান্য হয়,গরীব দুঃখীলোক তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, এই রূপে অনেক দেশেই অন্নকষ্টের তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে লোকে একটা না একটা উপায় করিয়াছে দেখা যায়,। কিন্তু আমরা কি করিতেছি?

দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আর সৌভাগ্যবশতই হউক, ভারতবর্ষে ওরূপ অন্নকষ্ট কখনই ছিল না। ভারতবর্ষের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা, চীনের মত ওরূপ ঘন বসতি আমাদের দেশে কখনই হয় নাই। প্রদেশ বিশেষে, মধ্যে মধ্যে অজন্মা চির কালই হইত বটে; কিন্তু তাহাতে এরূপ সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ কখনই হইত না। কোন একটী প্রদেশে অনাবৃষ্টি হইলেই অজন্মা হইত। সেই দেশে যে সঞ্চিত

শস্য থাকিত তাহা হইতেই হয় ত সেই অজন্মার দুঃখ দূর হইত; না হইলে, নিকটস্থ দেশ হইতে শস্য আসিত। অজন্মার সময় ধনশালী লোকে ধান্য দিয়া, পুষ্করিণী খনন, বাঁধ বাঁধান, জাঙ্গাল দেওন প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া লইতেন; কচিৎ বা কোন ক্ষুদ্র দরিদ্র প্রদেশের কতক লোক মরিয়াও যাইত; এখন যেমন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শুদ্ধ কেবল হাহাকার হইতেছে, এরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বে হইত না। হইলে, আমরা অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিতে শিখিতাম; হয়, অন্য দেশে দিগ্বিজয় করিতে যাইতাম, নতুবা ভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতাম, অথবা বিদেশে বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতাম। যাহা হউক, বহুদিন এরূপ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ কখনই কোন দেশে থাকিতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে হয় সকলে মরিয়া যায়, না হয় একটা না একটা কিছু কিনারা করিয়া তুলে। বর্ত্তমান সময়ে যে রূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিছু কিনারা না করিলে, আমরা নিশ্চয় মারা পড়িব, তাহাতেই বলিতেছি—ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিতেছি?

উল্কাপাত।

উল্কাপাত সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা লেখা যাইতেছে।

উল্কা কি? বুধ, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইরূপ অতি ছোট ছোট কোটী কোটী গ্রহখণ্ড ঝাঁক বাঁধিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পৃথিবী প্রভৃতির যেরূপ এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, ঐ সকল গ্রহখণ্ডও সেইরূপ এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে। যখন পৃথিবী ঐ সকল গ্রহখণ্ডের নিকটে যায়, তখন তাহারই মধ্যে দুই চারিটা বা কতকগুলি, আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর দিকে আইসে। অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে সচরাচর এইরূপ হইয়া থাকে। এপ্রেল, মে, জুন, এ সকল মাসেও কদাচিৎ উল্কাপাত দৃষ্ট হয়।

উল্কার আলো কিসের? উল্কার নিজের আলো নাই। বড় গরম হইয়া জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবী ১ ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল চলিতেছে; পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কা সকল এক মিনিটে ১২০০ মাইল

হিসাবে পড়িবার বেগ পায়। উল্কা সকল যখন পৃথিবীর স্থির বায়ু মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহারা প্রায় এক সেকেণ্ডে ৩০ মাইল হিসাবে পড়িতে থাকে; সুতরাং বায়ুর ঘর্ষণে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া জ্বলিতে থাকে। ক্ষুদ্র হইলে জ্বলিতে জ্বলিতে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশাইয়া যায়। বৃহৎ হইলে মাটীতে পড়ে। কখন কখন এত আলো হয় যে দিনের বেলাও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ হয় কিসের? যে কারণে পটকায়, দোদমায়, ও বোমে আগুণ লাগিলে শব্দ হয়, সেই কারণে উল্কাতেও কখন কখন শব্দ হইয়া থাকে; অর্থাৎ কিয়দ্দূর আসিয়া বেশী গরম হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহাতেই শব্দ হয়। কখন কখন এমন শব্দ হয় যেন হাজার হাজার কামান দাগিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

উল্কাতে কি কি থাকে? কলিকাতার সোসাইটির যাদুঘরে দুই আলমারি উল্কা আছে। দেখিতে ঝামার মত; ভাঙ্গিলে ভিতরে ইস্পাতের মত। ইহাতে গন্ধক, ফস্ফরস, অঙ্গার, বালি, লোহ, টীন, পোতাস, শোরা, তামা, সীসে, পাথর—আরো

কয়েক প্রকার পদার্থ থাকে; সকল গুলায় সব রকম থাকে না। কোন উল্কাপিণ্ড সমস্তই প্রায় লৌহ; কোনটায় বা লৌহ কম থাকে; পৃথিবীতে নাই, বা রসায়নজ্ঞগণ জানেন না, এমন কোন পদার্থই উল্কাপিণ্ডে থাকে না। তবে অনেক সময় পাঁচটা ধাতুতে এবং উপধাতুতে এরূপ মিশ্রিত থাকে, যে সেরূপ সংযোগ পৃথিবীতে সহজ অবস্থায় দেখা যায় নাই।

গুটিকত প্রসিদ্ধ উল্কাপাতের কথা।—(ক) ১৮০৩ সালের ২৬শে এপ্রেল ফরাসি দেশের নরমাণ্ডি প্রদেশে লাইগল নগরে বেলা দুইটার সময় ভীষণ আওয়াজ হয়। ৪০ ক্রোশের মধ্যের লোক একটি মাত্র উল্কা দেখে। কিন্তু পরে দেখা যায় ৯ নয় মাইল দীর্ঘ ৬ ছয় মাইল প্রশস্ত ভূমির উপর প্রায় দুই হাজার প্রস্তর ছড়ান আছে। (খ) জর্ম্মানিতে বিয়েনা ও প্রেগের মধ্যবর্ত্তী ষ্টানমেন নগরে ১৮১২ সালের ২২শে মে ঐরূপ উল্কা দৃষ্ট হয়। ৮ আট মাইল দীর্ঘ ৪ চারি মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে প্রায় দুই শত প্রস্তর পতিত ছিল। (গ) ফরাসি দেশের দক্ষিণ দিগ্‌স্থিত অর্গইল নগরের নিকট

১৮৬৪ সালের ১৪ই মে একটি উল্কা দৃষ্ট হয়। ১৮ আঠার মাইল দীর্ঘ ৫ পাঁচ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে প্রস্তর ছড়ান ছিল। (ঘ) হঙ্গেরি দেশের কুইয়াহিনজা নগরে ১৮৬৬ সালে ৯ই জুন ১৬ ষোল মাইল দীর্ঘ ৪ চারি মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডে প্রায় সহস্র প্রস্তর বিস্তৃত ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা বড় খানি ওজনে প্রায় ৮ মণ হইবে। যতটা ভূমি লইয়া পাথর গুলি ছড়াইয়া পড়ে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাথরখানি প্রায়ই সেই ভূমির এক কিনারার দিকে থাকে।

বারইয়ারি।

বারইয়ারি পূজা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গেলে বড় দুঃখের বিষয় হইবে। অথচ যে ভাবে এতকাল বারইয়ারি চলিয়া আসিতে ছিল, সে ভাবে রাখিলে আর থাকে না, কোন কোন বিষয়ে একটু আধটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

একশ, দুইশ, হাজার লোক একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্র হওয়া কেবল এক বারইয়ারিতে দেখিতে পাওয়া যায়; যদি বার-ইয়ারিতে সহস্র দোষও থাকে, তবে ঐ একটি জিনিসের জন্য বারইয়ারি রাখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দোষ গুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সকল স্থানের শিক্ষিতসম্প্রদায়, সাধারণ জনগণ হইতে দূরে থাকেন, মিলিতে চান না; এরূপ না হইলে এতদিন বারইয়ারির উন্নতি হইত; হয় নাই,—সে কেবল শিক্ষিতের অভি-মানের ফল, অবহেলার দোষে।

যেখানে ব্যবসাদার লোক কিছু বেশী আছে, সেই খানেই বারইয়ারির প্রাদুর্ভাব আছে। এই সকল

ব্যবসাদারের সহিত কৃতবিদ্যগণের মিশ থাইতে হইবে। তাহা হইলে অতি সহজেই বারইয়ারির দল হইতে অনেক কাজ পাওয়া যাইবে। প্রায় সকল স্থানেই বারইয়ারির একজন খাজাঞ্চি ও কতকগুলি বাঁধি পাণ্ডা আছেন। ইংরেজি করিয়া বলিলেই তাঁহারা কমিটি। প্রায় সকল পল্লীগ্রামেই এইরূপ কমিটি আছে; এই সকল কমিটি ইংরেজ রাজত্বের ইংরেজি ওয়ালার বক্তৃতার ফল নহে; বহুকাল হইতে আছে। এই কমিটি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ জুলুম করিয়া, সম্বৎসরে বিস্তর টাকা সংগ্রহ করেন, বৎসরান্তরে সংগৃহীত টাকা প্রায় সমস্তই সৎকর্ম্মে,অসৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়া ফেলেন। এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,—ইহার উন্নতি জন্য ভদ্র লোকদিগকে আপাতত তিনটি বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। (১) চাঁদা আদায়ের সময় গরীবের উপর জুলুমটা না হয়; (২) ব্যয়সম্বন্ধে, সংগৃহীত সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া না যায়, একটি স্থায়ী বারইয়ারি ফণ্ড থাকে। (৩) অসৎকর্ম্মে ব্যয় টা কমে আর সৎকর্ম্মে ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

প্রথম কথা সম্বন্ধে, যুক্তি প্রদর্শনের আবশ্যক নাই ; কথাটা পাণ্ডাদের মনে থাকিলেই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় কথা—বারইয়ারির একটি স্থায়ী ফণ্ড রাখা। এখনকার কালে এটি বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, যে দেশমধ্যে এখন দিন দিন অন্নকষ্ট বাড়িতে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর জ্বালাও বাড়িবে ; রামহরি ঘোষের বৃদ্ধাবস্থায় বড় কষ্ট হইয়াছে, বারইয়ারির টাকা হইতে তাহাকে মাসে মাসে ১১ টাকা করিয়া দেওয়া গেল। মিত্রপাড়ার কিনু তাঁতির তাঁতবুনে কিছুতেই চলে না, বারইয়ারির টাকা হইতে কিনুকে তাহার তাঁতঘরের একপাশে একখানি ছোট মুদিখানার দোকান করিয়া দেওয়া হইল। মিত্রপাড়ায় দোকান ছিল না, তাঁহাদেরও একটু সুবিধা হইল, আর কিনুও কাপড় বুনিতে বুনিতে তেল, লুন, চিঁড়ে, মুড়কি বেচে,যেমন করে হোক্, মাসে আর পাঁচ টাকা পাইতে লাগিল। কাগজি পাড়া জ্বলে গেল ; কতকগুলি লোকের দাঁড়াইবার স্থল নাই; বারইয়ারি হইতে দশজনকে দশ টাকা করিয়া একশ টাকা দেওয়া গেল, গরী-

বেরা ঘর তুলিয়া মাথা বাঁচাইল। কার্ত্তিক মাসের শেষে জ্বরে লোকগুলা অবসন্ন হইয়া পড়িল; বারইয়ারির টাকা হইতে চারি শিশি কুইনাইন আনিয়া মধু গোলদারের আড়তে রাখা গেল, শ্রীনিবাস নেটিব ডাক্তার যে সকল গরীবকে কুই-নাইনের ব্যবস্থা দিলেন, তাহাদিগকে একটু আধটু দেওয়া গেল। এখন যেরূপ অবস্থা, ঐরূপ নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য এখন সকল গ্রামেই মধ্যে মধ্যে টাকার প্রয়োজন হয়, সেই সময় তাড়াতাড়ি চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একটি বাঁধি ফণ্ড থাকিলে বিস্তর উপকার হইতে পারে। আর একটু মনোযোগী হইলে, এরূপ ফণ্ড জমা রাখা অসাধ্য নয়। যে টাকা উঠে, তাহার সিকি টাকা, কোন ব্যাঙ্কে বা কোন মহা-জনের কাছে জমা রাখিলে, কিছু কিছু সুদও আসে, আর আবশ্যক হইলে অল্প স্বল্প লইয়া অনেক ছোট ছোট সৎকার্য্য হয়।

তৃতীয় কথা সৎকর্ম্মে ব্যয় বাড়ুক, আর অসৎ-কর্ম্মে ব্যয় কমুক। কথাটা ভাল,—সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলা হয় না। কোন্

কোন্ কাজটা ভাল, কাজটা মন্দ, এ তর্ক চারিকাল আছে, সকল দেশেই থাকিবে; বারইয়ারিতেও থাকিবে। কিন্তু যে সকল কাজ সকল দেশের ভদ্র লোকই নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করেন,—সে সকল কাজ বারইয়ারিতে থাকা—নিতান্ত কলঙ্কের কথা, এবং সেই জন্যই বারইয়ারি শিক্ষিতের ত্যাজ্য হইয়া উঠিতেছে।

প্রতিমা পূজা—ত্যাজ্য নহে; উহাতে সাধারণের মনোমধ্যে ভক্তির পরিপুষ্টি হয়; সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বারইয়ারি পূজা না থাকিলে, দেশীয় কুম্ভকার, চিত্রকর, প্রভৃতির আরও দুর্দ্দশা হইত। সং—ইহাও ত্যাজ্য নহে। যে দেশে চিত্র দ্বারা ব্যঙ্গ প্রকাশ করার রীতি নাই, সে দেশে সং থাকা আবশ্যক; আর বারইয়ারি মণ্ডপই তাহার প্রকৃত স্থল। সেকালের সং—যুবতী স্ত্রীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বাউরিচুলে বাবু স্কন্ধে লইয়া, জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন-মলিন-বসনা বৃদ্ধা মাতাকে সম্মার্জনী প্রহার করিতেছে,—এসকল সেকালের সং—এখনকার দশখানা নাটকের চেয়ে ভাল। সংটা থাকা চাই—বিশেষ

এখনকার সময়োপযোগী করিলে আরও ভাল হয়। গড়িতে পারিলে এরূপ সং দ্বারা উপকার আছে।

এতদ্ভিন্ন বারইয়ারির, অন্নক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, কথকতা, পুরাণপাঠ, রামায়ণ, যাত্রা এ সকলই ভাল; বরং এ কথা বলা যাইতে পারে, যে যাই বারইয়ারি ছিল, তাই ও সকল আছে। কিন্তু বেশ্যা, মদ এবং অশ্লীলতা না তাড়াতে পারিলে বারইয়ারিতে ভদ্রতা নাই। যাঁহারা গান শুনিতে হইলেই "গ্রাস করে কাল" ফরমাস করেন, আমরা তাঁহাদের পক্ষপাতি নহি; কিন্তু তাই বলিয়া বেলকুমি, এবং আমোদ যে একই জিনিস, তাহা বলি না। ভরসা করি আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা ঐ দুটি জিনিশের ভেদ বুঝিয়া বারইয়ারিতে কেবল আমোদ করিবেন, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বেলাল্লাগিরিটে উঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে, বারইয়ারি অচিরাৎ আমাদের দেশের একটি গৌরবের সামগ্রী হইবে।

দান করে নাম কেনা।

স্ত্রীলোকের কিরূপ বেশভূষা হওয়া উচিত,—পুরুষের কিরূপ পরিচ্ছদ করা কর্ত্তব্য,—কাওয়ার সময় হিন্দুস্থানীরা অশ্লীল কথা ব্যবহার করে,—বারাঙ্গনাগণ গবাক্ষদ্বারে কুৎসিত ভঙ্গি করে,—ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণে পাপ আছে,—কায়স্থের যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য—এইরূপ সহস্র সহস্র কথা লইয়া—সমাজের বাহ্যিক আচার ব্যবহার লইয়া, আমরা ক্রমেই বিব্রত হইতেছি; ওদিকে সমাজের অভ্যন্তর দেশ যে ক্রমেই অসার হইয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না। রোগীর গাত্র-ব্রণ মোচনের জন্য প্রলেপের প্রকরণ লইয়া বিবাদ চলিতেছে, ওদিকে রাজ-যক্ষ্মায় যে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতেছে,তাহা জানিতে পারিতেছি না।

সমাজের কেবল ছাদ দেখিয়া, জীর্ণ সংস্কার করিতে ব্যস্ত আছি; নীচের ভিত্তিতে যে লোণা লাগিয়াছে, প্রাচীর মূল যে দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, একবার সেদিকে তাকাই না। সর্ব্বশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িলে ছাদের দাগরাজিতে কি উপকার দিবে?

বঙ্গসমাজ বহুদিন হইতে আড়ম্বর-প্রিয় হইতেছে; বোধ করি মুসলমানগণের নিকট হইতে আমরা এই কুশিক্ষা পাইয়াছি। তুরস্কে, পারস্যে মুসলমানেরা যেরূপ থাকুন না কেন, আরবের মরুভূমিতে, কাবুলের পর্ব্বতে, তাতারের প্রান্তরে তাঁহারা নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন; হিন্দুস্থানের বাদশাহী পাইয়া ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া ক্রমে আড়ম্বর প্রিয় হইয়া উঠেন। সম্ভবত বাঙ্গালি ইঁহাদের নিকট হইতে এই নির্ব্বুদ্ধিতা অভ্যাস করিয়াছে। ফলত যে কারণেই হউক, বহুদিন হইতে বঙ্গসমাজ বাহ্যিক আড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত আছে। অতি দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত পুত্র কন্যার বিবাহের সময়, মাতা পিতার শ্রাদ্ধের সময়, ঋণ করিয়া আড়ম্বর করে; ভদ্রলোকের বাড়ীর ভোজে এত লোকের নিমন্ত্রণ হয়, যে গৃহস্বামী প্রত্যেককে "ভাল আছেন, মহাশয়," বলিবার অবসর পান না, বসিবার স্থান সংস্থান করিতে পারেন না। কতকগুলা লোককে আহ্বান করিয়া, কতকগুলা দ্রব্য সামগ্রীর অপচয় করিয়া, হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া খুব কতকটা গণ্ডগোল না করিতে পারিলে, আমাদের সমাজের

মতে ক্রিয়া' করাই হইল না। নাচ তামাসায়, নিশান পতাকায় না হউক, দীয়তাং ভুজ্যতাং টা আড়ম্বরে হওয়া চাই।

আহার, ব্যবহার, লোক-লৌকতায় বঙ্গসমাজ আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সৎকার্য্য সাধনে এখন যেরূপ আড়ম্বর হইয়াছে, বোধ করি দশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ৺ রমানাথ সেনের মত নীরবে অন্নদান, পল্লীগ্রামের অনেক ভদ্রলোকে-রই অভ্যাস ছিল।

এখন হইয়াছে,—দান করে, নাম কেনা। যে দান করে,তাহার নাম করাই ভাল; কেহ করিলেও আপত্তি করা ভাল দেখায় না; কিন্তু দাতা যদি কেবল নাম কিনিবার জন্য দান করিতে সংকল্প করেন, তাহা হইলে সমাজের বড় অনিষ্ট হয়। উপযুক্ত পাত্রে দান হয় না; যেখানে দান করিলে, সমাজে ঢি ঢি হইবে, গেজেটে নাম উঠিবে,সাহেবে সুখ্যাতি করিবে, কেবল সেইখানেই অর্থপাত হইতে থাকে; অর্থাৎ যাহারা আড়ম্বরে ভিক্ষা করিতে শিক্ষা করে তাহারা অর্থলাভ করে, যাহারা নীরবে যাচ্ঞা করে তাহারা কোন সাহায্য পায় না।

আজি কালি অনেকেরই দান করিয়া, নাম কিনিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ফল এই হইয়াছে যে দরিদ্র ভদ্র লোকের, অনাথা ভদ্র বিধবার ভিক্ষা মেলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি আধুনিক বড় মানুষের ইচ্ছা হইয়াছে, যে আড়ম্বরে দান করিয়া বাহাদুরী লাভ করিব। বাঙ্গালায় অন্নকষ্টের সীমা নাই, লক্ষ বলুন, কোটি বলুন, দান করিতে ইচ্ছা হইলে সৎপাত্রের অভাব নাই; অথচ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যে কোন বড় মানুষ বিলাতে কোথায় জাহাজে আগুণ লাগিল অমনই নাবিকদের সাহায্যার্থ টাকা পাঠাইয়া দিলেন; তা আবার কার হাতে? গেজেটের গেজেট—টাইম্‌স পত্রের সম্পাদকের হাতে। এরূপ করিয়া নাম কেনাকে আমরা দুর্নাম কেনা বলি।

বড়লোকের এইরূপ নীচ প্রবৃত্তির দমনের চেষ্টা করা সমাজের কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আজি কালি দেখা যাইতেছে, সমাজ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ছল করিয়া বড় লোকের ঐ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কাগজে, কলমে, গেজেটে, ইংরেজিতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার

না করিলে সমাজের যে তৃপ্তি হয় না—এমন কোন কথা নাই, তবে দাতাকে আড়ম্বরাভিলাষী করা কেন ?

মরীচদ্বীপে আকের চাস ও চিনির কারবার।

মরীচদ্বীপের পরিমাণ ৭০৮ বর্গমাইল। ১৮৭১ সালে লোকসংখ্যা ৩১৬০৪২ জন। ১৮৭০ সালে মরীচদ্বীপে ১৪৫২৮৯ একর ভূমিতে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ বিঘাতে আকের চাস ছিল। পৃথিবীতে প্রতি বর্ষে যত চিনির কাট্‌তি হয়, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ চিনি এই ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মকলক সাহেবের গণনা মতে ১৮৫৮ সালে সমগ্র পৃথিবীতে সাড়ে বার লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই বৎসর মরীচদ্বীপে ১২৬২৫০ টন চিনি হয়। ১৮৬২।৬৩ সালে খুব বেশী চিনি হইয়াছিল; সে বৎসর ১৬৫০০০ টন উৎপন্ন হয়। ৭৮ সালে সওয়া লক্ষ টন হইয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের কোন্ নগরে কোন্ জিনিসের বেশী প্রাদুর্ভাব,—তাহা একটা ছড়া আছে।

"মাটী বেটী মিথ্যা কথা; তিন লয়ে কলিকাতা।"

"আমড়া পায়রা রাজা ধান; চারি লয়ে বর্দ্ধমান।"

সেইরূপ ছড়া করিতে হইলে বলিতে হয় ;—
আকের চাস, চিনির চাপ, দুই লয়ে মরীচ দ্বীপ।

মরীচদ্বীপের প্রধান সহরের নাম লুইবন্দর। সেখানে অলি গলি, পথে ঘাটে কেবল চিনিরই ওড়ন পাড়ন। সেখানে দুই এক বিঘা পরিমাণের ছোট ছোট ক্ষেতে আকের চাস হয় না ; পূর্ব্বে নদিয়া জেলা প্রভৃতিতে যেরূপ বড় বড় ষ্টেটে নীলের চাস ছিল, এখন আসামে যেরূপ চা চাস হইতেছে, মরীচদ্বীপে আকের চাসও সেইরূপ। কুড়ি বিঘা দীর্ঘে কুড়ি বিঘা প্রস্থে অর্থাৎ ৪০০ বিঘার কম ষ্টেট নাই ; আবার এক লক্ষে ১৬০০০ বিঘার চাসও আছে। এইরূপ ছোট বড় প্রায় সওয়া তিনশত আকের চাসের ষ্টেট আছে।

সে দেশে এক বিঘায় গড়ে ১০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়। তবে স্থানে স্থানে এমন ক্ষেতও আছে, যে সেখানে বিঘা করা ২০ মণ পর্য্যন্ত চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখনকার হিসাবে ১০ মণের দাম সে দেশে ১০০৲ টাকা হইবে। অল্প স্বল্প টাকা লইয়া মরীচ দ্বীপে চাস করিবার কিছু সুবিধা নাই। বড় বড় ষ্টেট না হইলে লাভ হয় না ; আর বিস্তর

পুঁজি থাকা চাই। অল্পদিন হইল, সেখানকার জন কয়েক উপযুক্ত লোক ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া চাস আরম্ভ করেন, তবু তাঁহাদের আক কাটিবার পূর্ব্বে টাকা ধার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং মরীচদ্বীপে আকের চাসে, এক ধনবানের লাভ হয়, আর এক মজুরদারগণের লাভ হয়। মজুরির বেতন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতন এখানেও দিন দিন বাড়িতেছে। সেই জন্য পূর্ব্বে ৩ | ৪ টাকা ব্যয়ে সওয়া মণ চিনি উৎপন্ন হইত ; এখন সওয়া মণে ৮ | ১০ টাকা খরচা পড়ে। সওয়া মণ বিক্রয় করিলে ১২।১২৷৷০ টাকা হয় সুতরাং আকের চাসে ও চিনির কারবারে গড়ে শতকরা ২০১ টাকা লাভ থাকে।

মরীচ দ্বীপে আকের চাসের প্রথা আমাদের দেশের মত নহে। প্রত্যেক ক্ষেত প্রস্থে প্রায়ই তিন রশি সওয়া তিন রশি করিয়া থাকে, লম্বার ঠিক নাই। চারিদিকে গাড়ি যাইবার রাস্তা আছে। ওসারের দিকে সতরঞ্চির ডোরার মত চারি হাত করিয়া জমি পরিষ্কার করা আর তার পাশের চারি হাত গরআবাদি। আবাদি চারি হাতের

মাঝামাঝি এদিকে দুহাত, ওদিকে দুহাত রাখিয়া, জুলি কাটা। মাঝের আচোট জমির উপর আবাদি জমির তাবৎ আবর্জনা ফেলিয়া রাখে। পাহাড়ে জমিতে আচোট জমিটা আবাদি জমি অপেক্ষা কখন কখন তিন চারি হাত উচ্চ হয়। সেই জুলি ধরিয়া প্রায় ১॥ হাত অন্তর একটী করিয়া গর্ত্ত কাটে, তাহাতে ৪।৫ সের করিয়া সার দেয়, এবং এক হাত লম্বা কাটা আক বসাইয়া তাহাতে অল্প মাটি চাপা দেয়। অতি অল্প সময় পরে প্রত্যেক গর্ত্ত হইতে ২০।৩০ টী করিয়া গেঁজুরি বাহির হয়। অনেক স্থানে গেঁজুরি বাহির হইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে পাতা চাপা দিয়া রাখে, নহিলে রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। চারা একটু জাতাল হইলেই চাসারা পাশের মাটী উল্টাইয়া দেয়, কেহ কেহ আকের গোড়ায় উচ্চ করিয়া মাটি ধরাইয়া দেয়। ১০ | ১৫ দিন অন্তর একবার করিয়া মাটী উল্টাইয়া দিলে আকের যুত ভাল হয়। ১৮ মাস গেলে আক কাটিবার উপযুক্ত হয়। সেই সকল আক সচরাচর ৬ হাত হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা আর তরলা বাঁশের মত মোটা হয়।

আকের ফুল হইয়া, ফুল ঝরিয়া গেলেই আক, কাটিতে আরম্ভ করে। ডগাগুলা গরুর খোরাক হয়, আর যত পারে শুকনা পাতা আক বাঁধিয়া লইয়া যায়, তাহাতেই কলের জালানি হয়। আক গুলা গাড়ি করিয়া কারখানায় চালান দেয়। বাকি শুকানা পাতা নাতা যাহা পড়িয়া থাকে তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়। সমস্ত ক্ষেত পুড়িয়া কাল হইয়া যায়। কিছু দিন পরে সেই সকল আকের গোড়া হইতে আবার গেঁজুরি বাহির হইতে থাকে। প্রথম প্রথম যখন মরীচদ্বীপে আকের চাস আরম্ভ হইল, তখন আকের গোড়া হইতে ১৪ | ১৫ বার কাটিয়া লওয়া চলিত; তাহার পর ফসল নিতান্ত কম হইলে গোড়া উপড়াইয়া দিয়া আবার নূতন বীজন বসাইত। এখন আর জমির সেরূপ উর্ব্বরা-শক্তি নাই; এবার এক গোড়া হইতে তিন বার মাত্র আক হয়।

মরীচদ্বীপের চিনি অতি উৎকৃষ্ট, খুব ভাল দানাদার; তাহার প্রধান কারণ সেখানে খুব ঢিমে জ্বালে রস পাক হয়।

পূর্ব্বে এখানে কেবল বোম্বাই আকেরই চাস

ছিল; তাহার পর, সকলে বুঝিতে পারিল, যে বোম্বাই আকে রাঙ্গা পোকা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধরে, তজ্জন্য সেই অবধি আমেরিকার আকের চাস করিতেছে।

পূর্ব্বে লুইবন্দর ফরাসিদের ছিল; তদবধি ফরাসী ভাষায় কথা কয়, এরূপ একপ্রকার ফিরিঙ্গীলোক সে দেশের ধনী, তাহাদেরই ষ্টেট্, তাহাদেরই কল কারখানা কারবার। চাসী, মজুর, মুটে, কলের কাজের কুলী—অধিকাংশই বাঙ্গালি—বেহারী এবং ছোটনাগপুরে লোক। ইহারা একরূপ আধ বাঙ্গালা কথা কয়।

সাধারণের উন্নতি।

কোন একটি দেশে কেবল উর্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যা শিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, আর অপর সাধারণের তাহা না থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও, সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবারের মধ্যে কখন লক্ষ্মী থাকে না, আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোক সকল অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন; দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই; কেবল ঐ একটী বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মাগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণী-

কৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। নিম্ন স্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্যে বা দ্বিজ-সেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেইবার ভারতে আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্ন স্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্র বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষের উন্নতি উন্নতি বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে, ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজারু ইটের কাঁচা গাঁথনি আছে; এবং বহুকালের গাঁথনি বলিয়া এখন লোনা লাগিয়াছে,কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্য-ভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি,

যে ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে, কিম্বা গায়ে বল থাকিলে, অথবা লেখা পড়া শিখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যত দিন থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক, ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, লেখা পড়া শিখুক, আর ভদ্র সন্তানের অবস্থা হীন হোক, এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি, সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীরবাসী ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল? না যেখানে ৫০ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, ৫০ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কার কারবারি শাঁসে-জলে ৫০০০ ঘর নবশাখ আছে; সেকরায় সোণা রূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁশারিরা ঢালাই গলাই করিতেছে, জেলে, বাগদি মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু পয়সা দু শিকি আছে, আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচ সাত জন লেখা পড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে এবং বিল

কবজ পড়িতে পারে.—এরূপ স্থানে থাকা ভাল?—আমাদের বিবেচনায় অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অল্প কস্ট সহ্য করিয়া বাস করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়; প্রমাণ বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি; যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের সমাজের পতি, তিনি সেইখানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, অজ্ঞান, এবং তমসাচ্ছন্ন। সমাজের নিম্নস্তর সকলের সম্প্রসারণ শক্তি না থাকিলে ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর কখন স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমত সাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচ জনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকে দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য

ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত,—শিক্ষার সার হইতেছে,—পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে; যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শেখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি; এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশ মধ্যে প্রচলিত করান নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শিক্ষা সহজে পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচ জনের জন্য ভাবিতে শিখিব। আমি যদি আরও দশ জনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশ জনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শিক্ষা-দোষে উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি

অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যত দিন উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্ন স্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন, এবং কার্য্যত সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আজি কালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণকে শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিতেছে। বড় আহ্লাদের কথা।

শরীর-পালন।

স্নানাহার প্রভৃতি কিরূপ নিয়মে করিলে শরীর বেশ ভাল থাকে, তাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই ; দুই এক জনের জানা থাকিলেও সে নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন না, অথবা করিতে পারেন না ; কাজেই আমাদের মত দুর্ব্বল এবং অসুস্থ জাতি আর নাই বলিলেই চলে। স্থানে স্থানে বড় বড় নদীতে চর পড়াতে অথবা জল নিকাশীর পথ অন্য প্রকারে বন্ধ হওয়াতে কোন কোন স্থানে ম্যালেরিয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এই বাঙ্গালা দেশ যে স্বভাবত নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর তাহা নহে ; কিন্তু শতকরা এখানে যত লোকের জ্বর হইয়া থাকে, এমন বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। কেবল জল বায়ুর বিকৃতিতে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা নয়, আমরা শরীর-পালনের নিয়ম সকল জানি না, জানিলেও মানি না, তাহাতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা।

দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। কোন একটি সভায়, কোন একটা মেলার স্থানে দেখিবেন, শত-

করা পাঁচ জন বেশ সুস্থ সবলকায় স্ফূর্ত্তিশীল লোক পাওয়া যায় না। কেমন একপ্রকার অবসাদ যেন সকলেরই মুখশ্রী আধিপত্য করিতেছে। তাহার পর কতকগুলির চক্ষুরোগ হইয়াছে, অতি অল্প বয়সে কাচ চক্ষুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন; কয়েকজনের অম্লরোগ আছে, মধ্যে মধ্যে বিকট মুখভঙ্গিতে উদ্গার তুলিতেছেন; কাহারও কাহারও শিরোরোগ আছে, একদিকে অঙ্গুষ্ঠ অন্যদিকে মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া মাথা টিপিয়া হেঁট হইয়া বসিয়া আছেন; কাহারও কাহারও মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়ার জ্বর হয়, এই গ্রীষ্মের দিনেও ফ্লানেল পরিয়া জ্বর নিবারণের চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন। দুর্ব্বলতা, তেজহীনতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা এ সকল ত সকলেরই আছে, উপরন্তু একটি না হয় আর একটি খাস রোগ অধিকাংশেরই আছে।

ক্রমে এমন দাঁড়াইয়াছে, যে এখন আর প্রায় চলে না। শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন এখন আর আমাদের কোন কাজেই সুপ্রতুল হইতেছে না। স্কুলের ছেলেদের লেখা পড়া হইতেছে না। যুবার ভোগ সুখ নাই, বিষয়ী বিষয় চিন্তা করিতে

পারেন না; দরিদ্রে অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে না, কাহারও কোন কর্ম্মে উন্নতি নাই। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, যে, সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমাদের সকলের সর্ব্বাগ্রে শরীর-পালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী-শিক্ষা, লোক-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রুচি-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার বিধবা-বিবাহ চালান, বহুবিবাহ উঠান, বাল্যবিবাহ থামান, গ্রন্থ লেখা, বক্তৃতা উদ্গীরণ,নাটক অভিনয় —প্রভৃতি যত কিছু কর না,—সাধারণ বাঙ্গালির যত দিন সবল সুস্থ শরীর না হইতেছে, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না। শরীর ভাল না থাকিলে কোন বিষয়েই মন লাগে না,—তুমি ভাল মন্দ যে কথাই বল, যত কথাই লেখ, আক্ষেপই কর, আর বিদ্রূপই কর, সাধারণ বঙ্গসন্তান যেরূপ রুগ্ন, ভগ্ন, শীর্ণ, মলিন, তাহার কোন কথাতেই মন লাগে না। কাণে শুনিল, মুখে পড়িল, হয় ত বেশ বলিয়াছে,বা বেশ লিখিয়াছে বলিল— কিন্তু শরীরে তেজ নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কাজেই ভাল মন্দ কোন কার্য্যই করিতে পারিল না।

শরীর পালনে যাহাতে সাধারণ বঙ্গবাসীর

অধিক যত্ন হয়, এমন প্রবৃত্তি, এমন উপদেশ বঙ্গবাসীকে দেওয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে গ্রন্থে শরীর পালনের নিয়ম শেখা যায়, এমন পুস্তক বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির ছেলেকে পড়িতে দেওয়া উচিত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কেমন করিয়া বড় লোক হইয়াছিলেন, তাহা পড়াইবার পূর্ব্বে, কিরূপ আহার করিলে ভাল থাকে, কখন স্নান করা কর্ত্তব্য, প্রত্যহ কখন কয় ঘণ্টা করিয়া ঘুমাইলে দেহের অবসাদ নষ্ট হয়, কিরূপে পানীয় জল পরিষ্কার করিতে হয়, কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, দুর্গন্ধাদি দূরীকরণের সহজ উপায় কি, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বালক বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেবল শিক্ষা দেওয়া নয়, যাহাতে শরীর পালনের নিয়ম তাহারা ভগ্ন না করে, তৎপক্ষে পিতামাতার এবং শিক্ষকের সর্ব্বদা নজর থাকা চাই। যদি ছেলেবেলায় খাবার শোবার নিয়ম অভ্যাস না থাকে, অপরিষ্কার পরিচ্ছদে থাকিতে কষ্ট বোধ না হয়, তবে বড় হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, বাঁধাবাঁধি নিয়মমত খাওয়া শোয়া করা—বড়

কষ্টকর হয়। এই জন্য অতি বাল্যকাল হইতেই শরীর পালনের নিয়ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল নিয়ম কার্য্যত অভ্যাস করিতে ছেলেপিলেকে লওয়ান উচিত।

প্রাচীন মিউনিসিপল প্রথা।

মিউনিসিপালিটি বা নগরসমাজ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট পদার্থ নহে। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও মিউনিসিপালিটি ছিল। পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। মিগাস্থিনিস্ নামক জনৈক যুনানী পণ্ডিত দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী সিলুকার সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেট হইতেছে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, অর্থাৎ আজি হইতে ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে। সেই সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ রীতি নীতি ছিল, শাসন প্রণালী প্রভৃতি কিরূপ ছিল, তাহা মিগাস্থিনিস্ গ্রন্থাকারে লিখিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তবে, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তা মিগাস্থিনিস্ কৃত গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

তদানীন্তন নগর-সমাজ সম্বন্ধে মিগাস্থিনিস্ বলেন,—নগরসমাজের কর্ম্মচারীগণ ছয় ভাগে বিভক্ত আছে; প্রত্যেক ভাগে পাঁচ পাঁচ জন

করিয়া লোক থাকেন। ১ম শ্রেণী, শ্রমজীবি-শিল্পীগণের উপর তত্ত্বাবধারণ করেন। ২য় শ্রেণী বিদেশ হইতে আগত লোকজনের তত্ত্বাবধারণ করেন। ইঁহারা বিদেশী লোকের বাসস্থান স্থির করিয়া দেন, এবং তাঁহাদের আচরণের উপর চর দ্বারা নজর রাখেন। তাঁহারা লোক সঙ্গে দিয়া বিদেশীদিগকে স্বদেশে পৌঁছিয়া দেন, নগর মধ্যে বিদেশীর মৃত্যু হইলে ইঁহারা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান করেন, এবং ত্যক্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে পাঠাইয়া দেন। ৩য় শ্রেণী, জন্ম মৃত্যুর তালিকা রাখেন; তাহাতে টেক্স আদায়ের সুবিধা হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন ব্যক্তির জন্মমৃত্যু ছাপা থাকে না। ৪র্থ শ্রেণী, ব্যবসা বাণিজ্যের তত্ত্বাবধারক; ইঁহারা মাপ বাটখারার পরীক্ষা করেন, প্রকাশ্য স্থানে শস্যাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন, দুই দফা টেক্স না দিলে ইঁহারা একজন লোককে দুই প্রকার ব্যবসা করিতে দেন না। ৫ম শ্রেণী, তৈয়ারি জিনিসের তত্ত্বাবধারণ করেন। ইঁহারা প্রকাশ্য ডিণ্ডিম দিয়া সেই সকল জিনিসের ক্রয় বিক্রয়

হইতে দেন। নূতন এবং পুরাতন জিনিস পৃথক্ বিক্রীত হয়, মিশাইলে বিক্রেতার দণ্ড ইঁহারা বিধান করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী, সমস্ত বিক্রীত পদার্থের মূল্যের দশ ভাগের একভাগ কর আদায় করেন। এই সকল কর্ম্মচারী পৃথক্‌রূপে বিভিন্ন কর্ম্ম করিলেও তাঁহারা একত্র কোন কোন কাজ করিয়া থাকেন যথা—সাধারণ ভবনাদির সংস্কার, জিনিসের দর বাঁধিয়া দেওয়া, হাট বাজার, দেবমন্দির, নদীর জেটি প্রভৃতির তত্ত্বাবধারণ করা।

এখনকার নগর সমাজের অবস্থার সহিত ঐ বর্ণনার তুলনা করিয়া দেখিবেন, যে উভয়ে কিরূপ বিভেদ আছে। তখনকার মতন এখন যে করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, তবে তখন যেরূপ কর্ম্মভেদে কর্ম্মচারী ভেদ হইত, এখন সেইরূপ হইলে, কাজ অধিক হয়, অথচ ভাল হয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

দেশভক্তি।

ইংরেজের মত স্বদেশানুরক্ত এবং স্বজাতি-প্রিয় জাতি বোধ হয় জগতে আর নাই। ইংরেজের স্বাবলম্বন, নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়; ইংরেজের অহঙ্কার, দম্ভ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য;—ইংরেজের দোষ গুণের অনেকটা ঐ স্বজাতি-প্রিয়তার ফল। ইংরেজ ঘোরতর স্বজাতিপ্রিয় বলিয়াই আপনাদিগকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া জানেন। সুতরাং বিপদে ইংরেজ অতুল সাহসী এবং কষ্ট সহিষ্ণু; সম্পদে ইংরেজ উদার হইলেও অহঙ্কারী। ইংরেজ স্বজাতির নিন্দা সহিতে পারেন না; আপনার কথার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেশের কথা ভাবেন, আপনার জাতির কথা ভাবেন। যে আপনার ভাল করিতে শিখিয়াছে, ভগবান তাহার ভাল করেন। কাজেই ইংরেজ জগতে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিয়া চলেন না; ইংরেজ আপনার দুই পদে ভর করিয়া, দুই বাহু সতেজে সঞ্চালন করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সোজা

হইয়া, উন্নত মস্তকে, প্রসারিত বক্ষে বিচরণ করেন। ইংরেজকে বাধা দেয়, এমন কেহ জগতে নাই; ভ্রূকুটি করিয়া ইংরেজ জাতিকে "হটো" বলে এমন জাতি জগতে নাই। ইংরেজের এত প্রতাপ এত গৌরব, এত মান, এত সাহস, কোথা হইতে হইল? ইংরেজের নানা গুণ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার অনেক গুণের মূল তাঁহার স্বজাতি-প্রিয়তা এবং স্বদেশবাৎসল্য। এই স্বজাতি-প্রিয়তা হইতেই ইংরেজের এত মান, এত সম্ভ্রম, এত ধন, এত ঐশ্বর্য্য।

যদি ইংরেজের স্থানে আমরা এই স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারি, তবেই তাঁহাদের রাজত্ব এবং আমাদের দাসত্ব সার্থক হয়। স্বজাতিবাৎসল্য মানবের একটি উজ্জ্বল ধর্ম্ম। যে কারণেই হৌক, আমাদের মধ্য হইতে এই ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছে, আবার ইংরেজচরিত্রে এই ধর্ম্ম প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিতে জাজ্বল্যমান। অদৃষ্টচক্রের সুকৌশল বিঘূর্ণনে এখন ইংরেজ আমাদিগের আদর্শ স্থানীয়। এমন অবস্থায় যদি ইংরেজের স্থানে স্বদেশানুরাগ শিক্ষা না কর, তবে শিখিলে কি? আর ইংরেজ যদি

আমাদিগকে স্বদেশানুরাগ না শেখান, তবে করিলেন কি ?

ইংরেজ যদি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটি করেন, —আমরা করিব কেন ? ইংরেজের দৃষ্টান্ত অহরহ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি ; বিদ্যালয়ে, বিচারস্থলে, পণ্যশালায়, শিল্পাগারে সর্ব্বত্রই ইংরেজ সমান স্বদেশানুরাগী। সকল কার্য্যেই দেখিবে, ইংরেজের স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমান। এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি আমরা স্বদেশানুরাগ শিক্ষা না করি, তবে আমাদের মত মূঢ় এবং নির্ব্বোধ আর নাই ; কেবল মূঢ় কেন ? প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুবিধা পাইয়াও তাহাতে পরাঙ্মুখ, সুতরাং পাপী।

এই পাপের ভাগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণে, প্রাণপণে চেষ্টা করিব। জানিয়া শুনিয়া কে বল পাপের ভাগী হইতে যায় ? আমরা জানি স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহাতে ত্রুটি করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে। তবে যাহাতে সাধারণের

স্বদেশানুরাগ শিক্ষা হয়, এমন কথা না লিখিয়া, না বলিয়া, নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় থাকিব কি রূপে?

স্বদেশানুরাগ শিখিবার অবশ্য নানা উপায় আছে। দেশের পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, বর্ত্তমান হীন অবস্থা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং আশার দুয়ার খুলিয়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আভা প্রদর্শন করিতে হইবে। দেশ ভাষায়, দেশীয় সাহিত্যে যাহাতে সাধারণের শ্রদ্ধা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। নিতান্ত কদর্য্য কুৎসিত রীতি নীতি ব্যতীত অন্য সকল প্রচলিত আচার ব্যবহারের তত্ত্ব সকল বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর স্বদেশানুরক্ত মহাত্মাবৃন্দের স্বর্গীয় কিরণ-ছটা বিভাষিত চিত্র সকল মধ্যে মধ্যে সাধারণের নয়ন সমক্ষে ধরিতে হইবে। পাঁচটা দেখিলে শুনিলে, পাঁচরূপ ভাবিলে চিন্তিলে, মহাত্মাগণের মহদন্তঃকরণের দিকে আকৃষ্ট হইলে, তবে ক্রমে লোক স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করে। স্বদেশানুরাগ আরাধ্য বস্তু, জগতের দুর্ল্লভ পদার্থ;—আমাদের মত বাস্তু-প্রিয়, পরিবার পোষক, সাংসারিক, অথচ সংসারে উদাসীন জাতির হৃদয়ে, অনেক কষ্টে

দেশভক্তির সঞ্চার হয়, অনেক কষ্টে ইহার পরি-পোষণ হয়, আর অনেক কষ্টে সেই দেশভক্তি সতেজ এবং সবল হয়।

মহাত্মা ম্যাটসিনির জীবন দেশ ভক্তির অভিনয় কাল। তাঁহার হৃদয় দেশ ভক্তির রঙ্গভূমি। এক জন নিঃসহায় নির্ব্বাসিত যুবা বিদেশে থাকিয়া, বা স্বদেশে লুক্কায়িত হইয়া, কেবল এক হৃদয়ের বলে, সেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী দেশ-ভক্তির আশীর্ব্বাদে,—একটি অধঃপতিত দেশ মধ্যে কি প্রকার উদ্যম, উৎসাহ, বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে, একদিকে যেমন বিস্মিত ও স্তব্ধ হইতে হয়, অন্য দিকে তেমনই স্বদেশানুরাগে হৃদয় উৎফুল্ল হয়। তবে আইস, এই ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইংরেজের প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া, এই অপূর্ব্ব স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করি, উহার পরিপোষণ করি, উহাকে সতেজ এবং সবল করি।

শক্তি-সেবা।

বাঙ্গালির উৎসব সম্বৎসরের মধ্যে তিন দিন। সেই তিন দিন বাঙ্গালি একবার আপনার দুর্ভার জীবনের জড়তা পরিত্যাগ করিয়া, উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে। মহাশক্তির কি মহীয়সী মহিমা! তাঁহার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির আরাধনা উপলক্ষে, এহেন বাঙ্গালি হৃদয়ও যখন নাচিয়া উঠে, না জানি তাঁহার জীবন্ত আবির্ভাবে, ভারতবাসী পূর্ব্বকালে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিত!

বহু দিন, বহু যুগ, বহু কাল হইল, আমরা শক্তি-সেবা পরিত্যাগ করিয়াছি, শক্তিসেবা ভুলিয়া গিয়াছি, মহাযন্ত্রী তাড়িত জড়যন্ত্রবৎ নিয়ামকের সংকল্প সাধন জন্য পরিচালিত হইতেছি। আমাদের গমনে লক্ষ্য নাই, আসনে স্থৈর্য্য নাই, কার্য্যে সংকল্প নাই; বচনে নিষ্ঠা নাই, হৃদয়ে আবেগ নাই, যোগে এক-প্রাণতা নাই। তথাপি যে মহাশক্তির ছায়া সন্দর্শনে আমাদের জড় প্রাণ এখনও নাচিয়া উঠে, সেই আমাদের একমাত্র আশা, এবং গুরুতর ভরসা।

নিরাশ্রয়ের তৃণাবলম্বনই ভরসা। যে মূর্ত্তিমতী কায়া দেখিবার আশা করে না, ধূমময়ী ছায়াই তাহার ভরসা। মহাশক্তির ছায়াময়ী মূর্ত্তির উপাসনাই এখন আমাদের ভরসা। যে মহাশক্তির ক্ষণমাত্র ছায়া পাইয়া এই ছয় কোটি জড়জীব বাঙ্গালি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে, না জানি একবার তাঁহার সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইলে আজি কি হইত! চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্বানর যাঁহার লোচন ত্রয়, ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে যাঁহার সমান দৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ কটাহ যাঁহার মস্তকের মুকুট, অনন্ত অন্ধকার যাঁহার আলুলায়িত চিকুর-জাল, নক্ষত্র পুঞ্জ যাঁহার কেশ কুসুম, যাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসে সমীরণ দিগদিগন্ত ধাবিত হইতেছে, দশ দিক যাঁহার বাহু, গ্রহ উপগ্রহাদি যাঁহার ক্রীড়া কন্দুক, ক্রোধ যাঁহার গ্রীষ্ম,হুঙ্কার যাঁহার বজ্রনাদ, যাঁহার মৃদুহাস্যে বসন্ত বিভাসিত হয়; লোক পিতামহ ব্রহ্মা যাঁহার পূজক,মহাকাল যাঁহার সেবক, বেদ যাঁহার স্তুতিপানে অক্ষম,পুরাণ যাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে পারে নাই, বিজ্ঞান যাঁহার নির্ণয়ে স্পর্দ্ধা করে না, কল্পনা যাঁর পদপ্রান্তে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারিলেই

আপনাকে ধন্য বলিয়া স্বীকার করে,—সেই মহাদেবী মহাশক্তির ধ্যান করিতে আমরা ক্রমে অশক্ত হইয়াছি। সে আর্য্য কল্পনা আর আমাদের নাই; হৃদয়ে সে আর্য্যশক্তি আর নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই। তাহার কিছুই নাই, তথাপি এখনও যে আমরা সেই মহাশক্তির ছায়া পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হই, সেই আমাদের গৌরবের কথা। কিন্তু এই ছায়াই যে আর কত কাল থাকিবে, আর সেই মহাদেবীর মানসিকী মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া, আমরাই বা তাঁহার ছায়া লইয়া কতকাল কাটাইব, তাহা কে বলিতে পারে?

বর্ষ পরে বর্ষ যাইতেছে, অশক্ত বাঙ্গালি মহাশক্তির কেবল মাত্র জড় উপাসনা করিতে করিতে দিন দিন আরও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে।

ভারতবর্ষের উপর দেবতাদের কোপদৃষ্টি বোধ হয় সর্ব্বত্রই সমান; তবে আমরা বাঙ্গালি, বাঙ্গালির দুর্দ্দশা আমরা চোখের উপর দেখিতে পাই, বাঙ্গালির দুর্দ্দশা আমাদের আপনাদের কথা, তাহাতেই আমরা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালির দুঃখের কথার বার বার জল্পনা করি। এক একবার বোধ

হয়, বাঙ্গালার উপর বুঝি বিধাতার বিশেষ কোপ দৃষ্টি আছে। বাঙ্গালার নদী সকল ক্রমেই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে; ছাগ, গো, মহিষাদি দিন দিন দুর্ব্বল এবং দুগ্ধহরা হইতেছে, আর দেশব্যাপী সম্বৎসরব্যাপী জ্বরে, বাঙ্গালা ক্রমেই উৎসন্ন যাইতেছে এবং অভাগা বাঙ্গালি ক্রমেই ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজ রাজ্যের এই প্রগাঢ় শান্তি, আধুনিক সভ্যতা সঙ্গত এই শাসনপ্রণালী, এই শিক্ষা বিস্তার; আর এই দূরত্ব নাশকারক লৌহপথে লৌহ শকট, তাড়িত বেগ ধারী টেলিগ্রাফ, জলপথে ধূম-তাড়িত ষ্টীমার—কৈ কিছুতেই এই অধঃপতনশীল বাঙ্গালার অধোগতি রোধ করিতে ত পারিতেছে না। না কিছুতেই কিছু হইতেছে না; না হইবারই কথা। যে আপনার ভাল করিতে আপনি চেষ্টা না করে, ভগবান কখন তাহার ভাল করেন না। বাঙ্গালি আত্মচেষ্টায় একান্ত বিরত, তাহাতেই বাঙ্গালির এই দুর্দ্দশা।

শক্তি-সাধনার প্রধান বীজ,—আত্ম-চেষ্টা এবং আত্মনির্ভরতা। বাঙ্গালির তাহা নাই বলিলেও

হয়। পরপ্রতিষ্ঠিত শক্তি সমক্ষে বাঙ্গালি কৃতাঞ্জলি হইয়া, শক্তি দেহি, বলং দেহি, যশো দেহি, মামং দেহি—বার বার বলিতে পারে, সেই শক্তিসমক্ষে গলদশ্রুলোচনে, বার বার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে পারে; কিন্তু যে শক্তি-সেবার বীজ শিখে নাই, তাহার উপর মহাশক্তি প্রসন্না হইবেন কেন? ইংরেজ, বিজ্ঞানশক্তি বলে পঞ্চভূতকে আপনার করায়ত্ত করিতেছে; ইন্দ্র তাহার শকট চালক, বরুণ তাহার কল পরিচালক, সূর্য্য তাহার চিত্রকর, চঞ্চলা তাহার সংবাদ বাহিকা—বাঙ্গালি, ইংরেজের বিজ্ঞানশক্তির মূর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইল, গলবস্ত্র হইয়া অহোরাত্র সেই বিজ্ঞানশক্তির কাছে বর যাচ্ঞা করিতেছে—কিন্তু যাহার আত্মচেষ্টা নাই, তাহার প্রতি দেবী প্রসন্না হইবেন কেন? ইংরেজ শিখিতে বলিলে বাঙ্গালি শিখিতে যায়, ইংরেজ লিখিতে বলিলে বাঙ্গালি লেখে, ইংরেজ আফিস খুলিলে বাঙ্গালির চাকুরি হয়, ইংরেজ রাস্তা করিয়া দিলে বাঙ্গালি পথ চলে, খাল কাটিয়া দিলে বাঙ্গালির নৌকা চলে; ইংরেজের রাজনীতি কৌশলে বাঙ্গালির মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয়, ইংরেজের সমাজ

নীতির অনুকরণে বাঙ্গালি ব্যস্ত। ইংরেজের জ্ঞানশক্তি, বিদ্যাশক্তি, নীতিশক্তি, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার শক্তির কাছে, বাঙ্গালি গললগ্নীকৃতবাসে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। সে বাঙ্গালির উপর মহাশক্তি প্রসন্না হইবেন কেন? যে আপনার ভাল আপনি করিতে জানে না, পারে না, চায় না, ভগবান কখন তাহার ভাল করেন না।

ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে রোমরাজ্যে পরিশ্রমের মূল্য ও আহারীয় সামগ্রীর দর।

সুবৃহৎ রোমরাজ্যের সম্রাট ডাইওক্লিষিয়ান ৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমরাজ্যের খাদ্য সামগ্রীর দর এবং শ্রমজীবী, ব্যবহারজীবী প্রভৃতির বেতনের হার বাঁধিয়া দেন। ১৮১৭ অব্দে উইলিয়ম ব্যাঙ্কস নামক একজন সাহেব এসিয়া মাইনর ভ্রমণ করিতে গিয়া চতুর্থ শতাব্দীর রোমরাজ্যের সেই নির্দ্ধারিত দর একখণ্ড প্রস্তরে খোদিত দেখিতে পান। তিনি যত্ন পূর্ব্বক তাহা অনুবাদিত করিয়া লোক-জগতে প্রচারিত করেন।

১৬ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমরাজ্যে লোক কিরূপ মজুরি পাইত, এবং আহারীয় দ্রব্যের কিরূপই বা দর ছিল, তাহা জানিতে বোধ হয়, অনেকরই ইচ্ছা হইতে পারে; এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সেই সব সামগ্রীর মূল্য কত, এবং সেই সেই পরিশ্রমের মজুরি কত—এ বিষয়টি তুলনা করিয়া

দেখিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমরাজ্যে পরিশ্রমের মূল্য—

১ দিনে ১ জন।

মজুরদার	৪।⁄৫
রাজ মিস্ত্রী	৪৷৶০
যে মার্ব্বলপাথর কাটে অথবা ভাল পাথর খোদিত করে	৫৷৶০
দরজি	৪৷৶০
সম্ভ্রান্ত লোকের জুতা-নির্ম্মাতা	১৪৻১৫
যোদ্ধ্ পুরুষ অথবা সেনেটারদের জুতা-নির্ম্মাতা	৯।⁄০
ঘোড়ার সহিস	১৸৵০
দরখাস্ত দিবার জন্য উকীল	২৩৵০
মোকদ্দামার বৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য উকীল	৯৩৷০

৩০৩ অব্দে রোমরাজ্যে আহারীয় সামগ্রীর দর কিরূপ ছিল দেখুন।

ইংরেজি এক পাইণ্ট—

সাবাইন মদ	২৷৶০

ভাল পুরাতন মদ	২৶০
এসিয়ার মসলাদার মদ	২৷৶০
ইজিপ্টের বিয়ার	৵১০
ওজন আধ সের—	
গরু ভেড়া প্রভৃতির মাংস	১৲
ছাগলছানা প্রভৃতির মাংস	১৷০
শূকরের চর্ব্বি	২৲
হরিণের মাংস	২৲
শূকরের মাংস	২৷০
ডুমুর-ভোজী শূকরের যকৃৎ	২৲
শূকরের চাট্‌নি ১ আউন্স ওজনে	২৲
১ টা মোটা ময়ুর	২৩৷৶০
„ মোটা ময়ূরী	১৮৸৶০
„ হাঁস	৯।৵০
„ মোরগ	৫৷৶০
„ পাতি হাঁস	৩৷৶০
„ খরগোশ	১৪৵০
„ তিত্তির	২৸৶০
„ থরা	৩৷৶০
„ সমুদ্রের মাছ	২।০

একটা	নদীর মাছ	১৶০
„	তালকপি	।৶০
„	ফুলকপি	।৶০
„	বিটপালঙের গোড়া	১৸৶০
আধ সের ভাল মধু		৭॥০
১ পাইন্ট বিনিগার		১৶০
আধ সের শুষ্ক পনীর		১॥৵০

রোমের প্রায় বার আনা লোক মৎস্য এবং পনীর খাইয়া জীবন ধারণ করিত। দেখা যাইতেছে, যে, সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য। ৫॥৵০ মূল্যে একটা মুরগী কিনিতে হইলে ভারতবর্ষের ইংরেজ মুসলমানকে আর মোরগ মাংসের আস্বাদন লইতে হইত না। আর শাক্ত হিন্দুরাই কি ৩৲ টাকা মূল্যে এক সের ছাগ মাংস খাইতে পারিত? একটা বিট পালঙের গোড়ার দর শুনিলেই হৃৎকম্প হয়—১৸৶০—কে কত খাবে, খাও। যদি একটা হাঁসের মূল্য ৯।১০ টাকা হয়, তবে ১টা হংসডিম্বের দাম কত? বোধ হয় ॥০ আনার কম নহে? সস্তার মধ্যে কেবল তালকপি, আর ফুল কপি;—বোধ হয় রোমীয়গণ এই দুই শাকের

বড় বিশেষ ভক্ত ছিলেন না। যাহা হউক ১৬ শত বৎসর পূর্ব্বের রোম রাজ্যের আহারীয় দ্রব্যের সহিত আমাদের দেশের এখনকার খাদ্য দ্রব্যের মূল্য তুলনা করিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এখন চারি পাঁচ আনা মূল্যে এখানে একটি হাঁস পাওয়া যায়, কিন্তু ৯।৴০ টাকা না হইলে রোমরাজ্যে তাহা মিলিত না। দেড় আনা হইলে বিট পালঙের গোড়া পাওয়া যায়,কিন্তু রোমরাজ্যে তাহার মূল্য ১৸৶০ ছিল। এরূপ প্রকাশ, যে, রোমের সম্রাট বিটিলিয়সের এক বৎসরের খাই খরচ ১৯ কোটি টাকা পড়িয়াছিল।

আবার এদিকে মজুরদারের কত বেতন দেখুন; একজন সামান্য মজুর মাসে—তখন ১৪০৲ টাকা রোজগার করিত; চামারের রোজগার ৪২৫৲ টাকা ছিল—এখানকার একজন প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের মাহিয়ানা অপেক্ষা বেশী। তখন যেমন খাদ্য দ্রব্যের দর বেশী ছিল, রোজগারও সেইরূপ বেশী ছিল।

সমগ্র ভারত।

এমন কেহ ভারতবাসী আছেন কি, যে তিনি সমগ্র ভারতের ভাবটি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন? ভূগোলে ভারতের বিবরণ বাল্যকাল হইতে পাঠ করা গিয়াছে, ইতিহাসে ভারতের কথা পুনঃ পুনঃ শুনা গিয়াছে, আমরা ভারতবাসী, ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভারতের স্তন্যদুগ্ধে দেহ পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু ভাই! ভারত কেহ দেখিয়াছ কি? তুমি অসাড় কোটি হস্তের দুইখানি হস্ত দেখিয়াছ, আমি অর্ব্বুদ অচল ভগ্ন পদের একটি পদ দেখিয়াছি, তিনি অগণিত রক্ত-স্রাবী ক্ষতের একটি ক্ষত দেখিয়াছেন। কেহ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া আলুলায়িত কেশরাশি তুল্য বনরাজির এক দেশ দেখিয়াছেন। কেহ বা কুমারিকা অন্তরীপতটে উপবিষ্ট হইয়া তুলারাশি-বহন-কারী, ঘোর-রাবী, সুনীল সিন্ধুর আন্দোলনে, অন্তরে অন্তরে মন্দ আন্দোলিত হইয়া ভারতের পদ-নখর গণনা করিয়াছেন। তুমি দক্ষিণ সাবাজ-পুরে একদিনের দীর্ঘনিশ্বাস ধ্বনি শুনিয়াছ, অথবা

দাক্ষিণাত্যের দুর্দ্দিনের হাহা ধ্বনি তোমার কর্ণ-গোচর হইয়াছে। কবি এক দিনের মলিন মুখ-চন্দ্রমার পাণ্ডুরচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া হৃদয়পটে চির অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর আমি দিল্লী দরবারের সেই নিষ্পন্দ, নিশ্চল, নিষ্কম্প, বাস্পভর ভাব ভাবিয়া এখনও বিচলিত হই—কিন্তু তুমি, আমি, তিনি, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা এক দেশ মাত্র। ভারত-কণা মাত্র,—সমগ্র ভারত, সম্পূর্ণ ভারত, ভারতের সন্তান দেখে নাই—দেখে না—দেখার আশা হৃদয়ে ধারণ করে না।

এই সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত, সহস্র পর্ব্বতা-বয়বে তরঙ্গায়িত-দেহ, সহস্র নদী প্রবাহে বিধৌত-মল,শস্য-শ্যামল, বনরাজি-সঙ্কুল, রত্ন-গর্ভ, উর্ব্বর-ভূ, অনন্ত জীবকোটির বিচরণ স্থল, বিংশতি কোটি মানবের আবাস ভূমি.ভারতবর্ষ—ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দেখিবার বস্তু বটে! কিন্তু আমরা ভারত-সন্তান, এ হেন ভারত আমরা দেখি নাই, দেখি না! এই অধোগতির দিনে ভগবানের করুণ কটাক্ষে ভারতবাসী বঞ্চিত আছে কি না, জানি না, কিন্তু

পূর্ব্বকালে ভগবান যে এই ভারতের জন্য আপনার সদাব্রত ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহার সন্দেহ নাই—এমন মনোহর তরুলতা-পূর্ণ শিখর মালা, এমন শ্যামল, মন্দ-মারুত-আন্দোলিত শস্য ক্ষেত্র,—এমন ধীর, গভীর, প্রবাহ-ধার নদ নদী, এমন শাল-তমাল-তাল-সঙ্কুল ঘন বিজন কানন, এমন পবিত্র সুপেয় পয়ো-নিঃসরণকারী প্রস্রবণ, সেই বিদ্যুদ্দাম-দীপ্ত, ঘন-ঘটাপূর্ণ, মুষল-ধার-স্রাবী বর্ষার আকাশ মণ্ডল, আর এই চুত-মুকুল-সৌরভপূর্ণ, পাপিয়া কুল-কোকিল আরাবিত বসন্তকাল—এমন কি আর কোথাও আছে না কি? আদিকালে,ভগবান ভারতের উপর করুণা বিতরণে কৃপণতা করেন নাই। আর ধর্ম্ম—কতকাল ধরিয়া কত কীর্ত্তিই না ইহাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে! কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, অবন্তী—এমনও কি আর কোথাও আছে না কি? আর ইতিহাস—কত যুগ যুগান্তরের গৌরব—শুধু গৌরব কি?—হায় কত কালের কলঙ্ক-ধ্বজা—বুকে করিয়া বসিয়া আছে। ভারত সন্তান এ সকল তুমি দেখিবে না ত দেখিবে কি? তাহার পর ইহার বৈচিত্র্য। কত

দেশ, কত নগর, কত গ্রাম, কত ভাষা, কত রূপ পরিচ্ছদ, কত বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহার—এক দেশে এত আর কোথায় আছে? দেখিবার পদার্থ বটে, আলোচনার সামগ্রী বটে। তবে আমরা অভাগা দেখিলাম না। আমরা ভাবিতে জানি না, ভাবিলাম না। আর শিল্পচাতুর্য্য—তাজমহল, সেকেন্দ্রা, গুরু-দরবার, ইলোরা, তাঞ্জোর, কাঞ্চী, কাশ্মীর, ভুবনেশ্বর, পুরী--ভারতের এই কয়টি স্থানে যাহা আছে, সমগ্র পৃথিবীতে তাহা আছে কি? দেখিবার সামগ্রী বটে—কিন্তু আমরা দেখিলাম না।

ভারতবাসী—ভারত কাহাকে বলে, তাহা জানে না, বুঝে না, ভাবে না; সমগ্র ভারতের বিস্ময়-কর, বিস্তার-পূর্ণ, বিশ্বোদর ভাব, কোন ভারতবাসী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না।—সমগ্র ভারত বলিলে প্রকৃত যে কি বুঝায়, তাহা আমরা বুঝি না—বুঝি কেবল একটা কথা মাত্র—ব্যাকরণের একটা সংজ্ঞা মাত্র।

সামাজিকতা।

ইতর—ভদ্র, ছোট—বড়, পণ্ডিত—অপণ্ডিত, চাকুরে—ব্যবসায়ী, নিরীহ,—দুষ্ট, নানা প্রকার লোক লইয়া একটি সমাজ হয়। এইরূপ পাঁচ প্রকারের লোকের মধ্যে যে যেমন তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিতে পারিলেই লোকে সামাজিক হয়। তাহা বলিয়া যে, অজ্ঞ লোকের কাছে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে, পণ্ডিতের সম্মুখে কেবল পাণ্ডিত্য ফলাইতে হইবে, ইতরের সহিত আলাপের সময় ইতরাম করিবে, বা বড় লোকের সহিত কথা বার্ত্তায় শুদ্ধ বড় কথাই কহিতে হইবে —এমন কোন কথা নাই।

সামাজিক লোককে, যে বহুরূপী সাজিতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই, আর সামাজিক লোক সকলের সহিত মিশেন বলিয়া, তাঁহার নিজের যে কিছু চরিত্রগত পার্থক্য নাই, তাহাও নহে। অনেকের এমন সংস্কার আছে, যে 'বরের ঘরে পিসি, কনের ঘরে মাসি' না হইলে বুঝি সামাজিক হওয়া যায় না,—সেটা বিষম ভুল।

"মধু বাবু লোকটা বড় সামাজিক। দেখ না— ব্রহ্মসভাতে যাইয়া কেমন চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া থাকেন, ব্রাহ্মিকাদের দেখিলে কেমন হাসিমুখে নমস্কার করেন, আবার ঘোষেদের বৈটকখানায় দেখ, দিব্বি ব্রাণ্ডি সেবন করিতেছেন; ঝিঁঝিটের টপ্পা গান করিতেছেন। আবার সেদিন দেখি, পাসা গরদের কাপড় পরে, নামাবলি গায়ে দিয়ে, ঈশান বাবুর হরিসভার দলের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। যেন পরম ভাগবত। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন না করিতে পারিলে মানুষই নয়। মধুবাবু, ভাই, বাস্তবিক বড় অমায়িক, লোকটা ভারি সামাজিক।" মধু বাবুর যে গুণের উল্লেখ হইল, আমরা সেগুণ গুণ বলিয়াই স্বীকার করি না। দোষ বলি। উহা সামাজিকতা বা অমায়িকতা নহে। উহা উভয় গুণের ব্যভিচার মাত্র। সামাজিক লোক যেখানে যেমন সেখানে তেমন নহেন। তাঁহারা যে যেমন, তাহার সহিত তেমনই ব্যবহার করেন মাত্র। তুমি আমি সকলের যেরূপ চরিত্র-বল থাকা আবশ্যক, সামাজিক লোকেরও সেইরূপ চরিত্র-বল থাকা চাই। যাহার

চরিত্র-বল নাই, সে ত মানুষই নহে। তার আবার সামাজিক অসামাজিক কি? গোল আলু দগ্ধ-কলেবরে দুঃখীর লোণা ভাতের সহায়। সিদ্ধ ভাবে স্কুলের বালকের শীত অবলম্বন। দশধা হইয়া মধ্যবিত্তের মাছের ঝোলের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। অখণ্ড মণ্ডলাকারে দম-রূপে মোদকের বিপণি আলো করিয়া থাকে—আলু যাতে দিবে তাতেই মিশে—তা বলিয়া কি আলুর নিজের তার নাই? নিজের তার না থাকিলে, গোল আলু তরকারির মধ্যেই গণ্য হইত না; আর নিজের চরিত্র না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্য মধ্যেই গণ্য হন না।

সামাজিক লোকের মধ্যেও অবশ্য নানা শ্রেণী আছে। সামাজিক হইলেই যে মূর্খ হইবে বা পণ্ডিত হইবে, নির্ব্বোধ হইবে বা বুদ্ধিমান হইবে,—এমন কোন কথাই নাই। তবে ঘৃণা এবং আত্মাদর একটু কম থাকা চাই এবং পরের ব্যথা বুঝিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা থাকা চাই। একটু ময়লা কাপড় দেখিলেই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে, একটা অশ্লীল কথা শুনিলেই কাণে হাত দিয়া পলায়ন করিতেছে, একটু কুলীনত্বের

গন্ধ আছে বলিয়া অথবা দুই পাত ইংরেজি উল্টা-
ইয়াছেন বলিয়া, গর্ব্বে কাহারও সহিত বসিতে
চান না, অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র হিন্দুস্থানী
কেবল লঙ্কা দিয়া রুটি খাইতেছে, দেখিয়া "এজি
ওঠো পোড়ায়কে লেও জি" বলিয়া আপনার
রসিকতায় আপনি অট্ট হাস্য করিলেন;—এরূপ
শ্রেণীর লোক কখন সামাজিক হইতে পারেন না।
সামাজিক লোকের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটু হৃদয়
থাকা চাই, আর ঘৃণা এবং আত্মাদর একটু কম
থাকা চাই। পাপে যে ঘৃণা, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই
থাকা উচিত, নহিলে পাপ হইতে কেবল 'বুদ্ধি
মনুষ্যকে বিরত করিতে পারে না। তবে যিনি
সামাজিক হইতে চান, তিনি যেন পাপীকে একটু
কম ঘৃণা করেন। আর আত্মাদর; আত্মাদরও
ত্যাগ করিবার সামগ্রী নহে। যে আপনার মর্য্যাদা
বুঝে না, সে পরের মর্য্যাদা বুঝিবে কেন? আর
যাঁহার আত্মাদর নাই, তাঁহাকে কেবল কর্ত্তব্য
জ্ঞানে সৎপথে স্থির রাখিতে পারে না সুতরাং
আত্মাদরও থাকা চাই। কিন্তু যে আত্মাদর
পরকে অনাদর করিতে শিক্ষা দেয়, তাহা সকল

সময়েই ত্যজ্য। এবং সামাজিক মানবের তাহা বিশেষ ত্যজ্য।

তবে কি সামাজিকতা এবং মনুষ্যত্ব এক? না এক নয়। সামাজিকতা কেবল আলাপে এবং ব্যবহারে; মনুষ্যত্ব, কার্য্যে; সুতরাং সামাজিকতা থাকিলেই যে মনুষ্যত্ব থাকিবে বা মনুষ্যত্ব থাকিলেই লোক সামাজিক হইবে,—এমন কোন কথা নাই। আর মনুষ্যত্ব সকল দেশে সমান; কিন্তু সামাজিকতা সমাজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। একজন সামাজিক ইংরেজ আমাদের মধ্যে হয় ত ঘোরতর অসামাজিক বলিয়া বোধ হইতে পারেন। অতএব সামাজিকতা একদেশ ব্যাপী।

সামাজিকতার বিশ্বব্যাপকতা ভাব নাই বলিয়া ইহা যে অল্প আদরের বস্তু তাহা নহে। কেন না সামাজিকতা না থাকিলে, সমাজের কোন সুখই ভোগ করিতে পাওয়া যায় না; সমাজবাস কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হয় মাত্র। যদি সমাজে সুখে থাকিবে, তবে সামাজিক হও।

মামলাবাজ।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে মামলাবাজ লোকদের প্রায়ই ঘর করণার শ্রী ছাদ থাকে না, ভোজন পানাদির নিয়ম থাকে না; এবং ছেলে পিলে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে না। কিসে সাক্ষীরা সন্তুষ্ট থাকিবে, উকীল মোক্তারেরা অল্প পয়সায় বেশী খাটিবে, কোন্ হাকিমের কোন্ দিকে ঝোঁক, কিসে ডিক্রীজারির পেয়াদা কৈফিয়ৎটা ভাল করিয়া দেয়, এই সকল তদ্বির করিতেই মামলাবাজ লোকের সময় যায়। কিসে পরিবার মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা হইবে, কিসে পুত্র কন্যা সন্নীতি শিক্ষা করিবে, পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচ জনের উপকার হইবে, কিসে সামাজিকতা বা মনুষ্যত্ব বজায় থাকিবে, সে দিকে মন দিতে তাঁহারা অব কাশ পান না। মামলার হার জিত, বা যোগাড় যন্ত্র ছাড়া ইঁহারা প্রায় সকল বিষয়েই উদাসীন এবং অদৃষ্ট-বাদী। কন্যার বিবাহ দিতে হইবে— মামলা করিতে করিতে স্বল্প অবকাশ কালমধ্যে— দশদিন একবার করিয়া আমাদের সমাজের নিন্দা

করিলেন, বলিলেন, যে সমাজে মেয়ের বিয়ের এত কষ্ট, সে সমাজে থাকিতে নাই। তাহার পর দশ দিন, বরের বাপেদের জাতি উচ্ছিন্ন করিলেন,—তাহার পর দশদিন ঘটকদের গালাগালি দিলেন, বলিলেন, তাহারা বড় অবিশ্বাসী; শেষে একটা দুনিয়ার বওয়াটে ছেলে ধরিয়া কন্যা সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "মেয়ের কপালে সুখ না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। এই যে ভবানী বাবু কত দেখে শুনে জামাই করেছিলেন,—মেয়ের যে এখন হাড়ির হাল হইল। তা বিধাতার লিপি কেহ কি খণ্ডাইতে পারে?" ছেলের লেখাপড়া শেগা—"তা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা—প্রাক্তনে না থাকিলে, কেমন করিয়া হবে বলুন? ছয় বৎসর স্কুলে দিলাম, তা হতভাগা হাতের লেখাটাও যদি দুরস্ত করে, তাও হয়, তা কিছুই করিল না। আপনি দিবারাত্র হুগলি আর আলিপুর করি, ওর পিছনে যে লাগিয়া থাকি তারই বা সময় কৈ?" স্ত্রীর ব্যারাম হইল—তাহাতেও অদৃষ্টই প্রধান চিকিৎসক; ডাক্তার, বৈদ্য,—কেবল উপলক্ষ মাত্র।

মামলাবাজ লোকে, মোকদ্দমা মামলা ছাড়া আর সকল বিষয়েই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেন। যাহা কিছু পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে—মামলাতে। সেই স্থলে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেই—কাপুরুষত্ব এবং নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। যোগাড়, যন্ত্র, তদ্বির—সলা, পরামর্শ, উপদেশ,—মামলা মোকদ্দমা করিতে গেলেই এ সকল চাই। অন্য সকল বিষয়ে অদৃষ্টই মূল, অন্যান্য উপাদান কেবল উপলক্ষ মাত্র।

কেবল মামলাবাজ লোক বলিয়া নয়,আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই প্রায় এই ভাব; তবে মামলাবাজ লোক সর্ব্বদা বিষয় রক্ষা বা বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত অথচ সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারী বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে কি না, সে কথা এক বারও ভাবেন না। এইটিই অধিকতর বিস্ময়ের কথা। উদরান্নের জন্য যে সমস্ত দিন পরিশ্রম করে, সে যদি সংসারধর্ম্ম না দেখে, তবে তাহার কথা তত ধরি না; যে কেবল আপনার আয়েশ টুকু বুঝিয়া, কোথায় এক গ্লাস মদ পাওয়া যাইবে, কোথায় দুখানা কটলেট মিলিবে, এই ভাবনায়

ব্যস্ত থাকে, স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভাবনা ভাবে না, তাহার কথাও বলা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে সংসারবিরাগী, সংসারে তাহার আস্থা নাই বলিয়া, দোষ দিলে চলিবে কেন? কিন্তু একজনের ছাঁচের জল তোমার গোয়াল বাড়ীর উঠানে পড়ে বলিয়া তুমি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিতেছ, এক আনা খাজানা বাড়াইবার জন্য দশ বৎসরের জমাওয়াশীলবাকী জাল করিতেছ, তোমার হইয়া মিথ্যা সাক্ষী দিল না বলিয়া যদু বাইতির জোত কাড়িয়া লইলে,—তুমি ঘোর বিষয়ী; অথচ তোমার সংসারধর্ম্মে মন নাই কেন? লক্ষ্মীছাড়াকে মেয়েটা দিলে—তোমাকেই ত ভুগিতে হইবে; অচিকিৎসায় স্ত্রীটাকে মারিয়া ফেলিলে, ক্ষতি ত তোমারই হইল। আর বিষয় বিষয় করিয়া কেবল মামলা করিতেছ, কিন্তু তোমার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তোমার কেনারাম যদি সমস্তই উড়াইয়া দিবে, তবে এত ভোগ ভুগিবার আবশ্যক কি?

রাজনীতিবাজ।

সাধারণ লোকের মধ্যে যেমন মামলাবাজ লোক, কৃতবিদ্যদলের মধ্যে তেমনি রাজনীতি-বাজ লোক। ইঁহারা ভাবেন, যে অহরহ রাজনীতি চর্চ্চা করিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল এবং আপনাদের পরম পুরুষার্থ সাধিত হয়। অন্য দশদিকে দেশ ডুবিয়া যাইতেছে, ইঁহাদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই, কেবল রাজনীতির দোষে যাহা হইতেছে, সেই দিকেই উহাঁদের দৃষ্টি। স্বীকার করি, যে, যে দেশের রাজা বিদেশী, বিধর্ম্মী, দেশের অবস্থাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে দেশে রাজার কার্য্যের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা, দেশের অবস্থার অনুপযোগী রাজনীতির প্রতিবাদ করা,—সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে রাজ-নৈতিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই দেখিব না, সেটা আমরা বড় ভ্রম বলি। আর, মামলাবাজ লোকের সংসার বৈরাগ্যের মত, নিতান্ত বিড়ম্বনা ও নির্বুদ্ধিতাও বলি।

যে জাতি সামাজিকত্বে বা মনুষ্যত্বে দিন দিন অধোগত হইতেছে, সে জাতি কি কেবল রাজ-নৈতিক আন্দোলন দ্বারা আপনার উন্নতি সাধন

করিবে? তাও কি কখন হয়? যাহার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলে সে ত পড়িয়া যাইবে। অথচ প্রতিনিয়তই দেখা যাইতেছে, যে রাজনৈতিক দলস্থ লোকেরা শয্যা-গতকে দাঁড় করাইবার এবং দৌড় করাইবার—চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ চেষ্টা যে নিষ্ফলা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ভারতবাসী দিন দিন ক্ষীণতেজ, হীনপ্রাণ, অল্পায়ু, দুর্ব্বল, ভক্তি-শূন্য, অনেক কার্য্যে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত, এবং অসচ্চরিত্র হইতেছে—এই অধঃপাতের গতিরোধ কি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে হইবে? আর তোমার রাজ-নৈতিক আন্দোলনের অর্থ ত—দরখাস্ত করা? তা যদি মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, প্রতিদিন, দুবেলা, রাজ সকাশে দরখাস্ত করা যায়, যে আমাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা নাই, তাহা হইলেই বা আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে কেন? রাজা দেখিতেছেন, যে যাঁহারা দেশে বড়লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা উপাধি পাইবার জন্য তোষামোদ ব্রতে ব্রতী, যাঁহারা জমিদার তাঁহারা প্রজাপীড়নে কুণ্ঠিত নহেন, রাজা

সাহায্য না করিলে, দেশে স্কুল চলে না, শিয়াল ক্ষেপিলে সিপাহী পাঠাইয়া গ্রাম রক্ষা করিতে হয়, কৃতবিদ্যগণ পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিতে, গ্লানি করিতে মজবুত, জুতা খাইয়া বলেন, "থাঙ্কুসর" —যখন রাজা দেশের অবস্থা দেখিতেছেন,— এইরূপ, তখন দরখাস্ত করিলে তিনি সে দরখাস্তে কর্ণপাত করিবেন কেন?

বাস্তবিক আগে আসন শুদ্ধি, জল-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি না করিলে পূজা, হোম, বলিদান, কিছুই হইতে পারে না। দেশের অবস্থার প্রকৃত উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, সামাজিক কষ্ট, সামাজিক অত্যাচার, এ সকল নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে, সকলেই আপন আপন চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করিতে হইবে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক আন্দোলন রাখিতে হইবে। নতুবা আর কোন দিকেই কিছু দেখিব না, কেবল রাজনৈতিক গণ্ডগোল করিব,—তাহাতে কাজ হইবে কেন? তাহাতেই আমরা বলি, সমাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চা হইলেই ভাল হয়।

———

হৃদয়ের দান।

কোন কাজে পুণ্য হয়, কোন কাজে অধর্ম্ম হয়,—দেশ-ভেদে ইহার মীমাংসায় মতভেদ থাকিলেও, দুঃখীর দুঃখ দূর করা যে একটি পরম ধর্ম্ম ইহা সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। "নোপকারাৎ পরো ধর্ম্ম" আমাদের শাস্ত্রের প্রধান উপদেশ ; দয়া বা চারিটি সকল ধর্ম্মের মূল বলিয়া বাইবেলে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্ব জীবে দয়া, বৌদ্ধদেবের সার উপদেশ। বাস্তবিক দয়ার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই। যিনি প্রকৃত দয়ালু, পরোপকার সাধনে যিনি সতত ব্যগ্র, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে পারিলেই যিনি আপনাকে সফল-জন্মা মনে করেন— সর্ব্বত্র সকল সমাজে তাঁহার আদর, সকলের কাছে তাঁহার সম্মান।

আজি কালি কথা উঠিয়াছে যে দয়ার বাড়া আর ধর্ম্ম নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলকেই দান করিতে হইবে ? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই ? সময় অসময় নাই ? আমাদের শাস্ত্রের সাধারণত যে রূপ উপদেশ, এবং সাধারণ লোকের

যেরূপ প্রবৃত্তি, তাহাতে আমরা এই বুঝি, যে কাহারও দুঃখে হৃদয় কাতর হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে, সাধারণত দয়ার কার্য্যে পাত্রবিবেচনা করিবে না, সময় অসময় ভাবিবে না। কথিত আছে, যে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনে তর্ক হয়—অর্জ্জুন বলেন, যে যুধিষ্ঠির বড় দাতা; শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যে যুধিষ্ঠির কেতাবী দাতা, কিন্তু আসল দাতা—কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য, অর্জ্জুনকে প্রচ্ছন্নভাবে দূরে রাখিয়া আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে যমুনা তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। যুধিষ্ঠির অবগাহনার্থ যমুনাতীরে উপস্থিত, সঙ্গে অনুচরবর্গ, তর্পণের কোশাদি, এবং কৌষেয় বস্ত্রাদি লইয়া আছে। ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি দরিদ্র, ভিক্ষার্থী। মহারাজার স্থানে কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি। যুধিষ্ঠির বিনয়ে বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি অস্নাত, অশুচি ক্ষত্রিয়। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাকে কিছু দান করিতে পারি না। আপনি যদি অপেক্ষা করেন, আমি স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে আপনাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান

করিতে পারি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সরিয়া গেলেন; রৌপ্য কোশা লইয়া বীর কর্ণ যমুনায় স্নান করিতে আসি-লেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমি দরিদ্র, আপনার নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি। কর্ণ বলিলেন, এখন আর কিছুত নাই, এই কোশা খানি লউন। অর্জ্জুন সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আপনি অস্নাত, অশুচি, পিতৃ তর্পণের উপকরণ ব্রাহ্মণে দান করি-তেছেন, একটু অপেক্ষা করিলেইত হইত? কর্ণ বলিলেন, অপেক্ষা করিব কি, যদি স্নান করিয়া আসিবার সময় দানের প্রবৃত্তি টুকু না থাকে, অথবা স্নান করিবার সময় যদি কুম্ভীরে লইয়া যায়, বা অন্য কোন প্রকারে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকেত কিছু দেওয়া হইল না। যখন মন হবে, আর হাতে কিছু থাকিবে, তখন দিতে পারি-লেই ভাল। অর্জ্জুন বুঝিলেন, যে কর্ণই প্রকৃত দাতা বটে। অর্জ্জুনের সঙ্গে ভারতবাসীও এত-কাল তাহাই বুঝিয়াছিলেন।

এখন নূতন সভ্যতায়, লোককে সকল বিষয়েই হিসাবী হইতে বলিতেছে; দান কার্য্যেও বাঙ্গা-লিকে হিসাবী হইতে বলিতেছে। বাঙ্গালি নূতন

সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়াছে। আপনার বুদ্ধি বিদ্যা প্রদর্শনার্থ বুক ফুলাইয়া বলিতেছে, "যাহাকে তাহাকে দান করিয়া দেশটাকে আর ডুবাইয়া দেওয়া হইবে না, দেশের নিষ্কর্ম্মা অলস লোককে আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সকলে মিলিয়া আমরা পাত্র পরীক্ষা করিয়া, তবে দান করিব।" সুতরাং হৃদয়ের দান কমিয়া গিয়া হিসাবের দানের ধুয়া উঠিতেছে।

উদরান্নের প্রত্যাশায় কেনারাম তোমার দ্বারে উপস্থিত। তুমি ইংরাজিতে পণ্ডিত; অবশ্যই তুমি মিলের অর্থ নীতি শাস্ত্রের নাম শুনিয়াছ;—তুমি সচ্ছন্দে কেনারামকে বলিলে,—আমি তোমাকে অন্ন দিয়া পাপের ভার বহণ করিতে পারি না। তোমার দেহে যে বল আছে, তুমি সচ্ছন্দে পরিশ্রম করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার।" কেনারাম কাতর স্বরে বলিল; "হজুর যা বলিতেছেন, তা ঠিক, আমি দেশ হইতে মজুরি করিতেই আসি; দুই তিন দিন ঠিকে কাজ করিয়াছিলাম, যাহা পাইয়াছি কতক খাইয়াছিলাম; চারি আনা পয়সা ছিল, রাস্তায় ময়লা

করিয়াছিলাম বলিয়া কাল সমস্ত দিন থানাতে আর কাছারিতে গিয়াছে ; পয়সা চারি আনাও গিয়াছে। কাল সমস্ত দিন আহার পাই নাই বলিয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছি; আবার দুটি আহার পাইলে, খাটিয়া খাইতে পারি।” এখনকার সভ্যতার রীতি এই যে, যত লোককে প্রকাশ্যত অপ্রকাশ্যত অধিক অবিশ্বাস করিতে পার, ততই তুমি অধিক বুদ্ধিমান্; তুমি তোমার পারিষদ্‌বর্গের প্রতি চাহিয়া বুদ্ধিমানের হাসি হাসিয়া বলিলে, “পাড়াগেঁয়ে লোকে মনে করে, যে সহরের লোক বোকা, তাহাদিগকে অনায়াসে ঠকান যায়—আচ্ছা বাবু তুমি যদি ক্ষুধায় কাতর, তবে অত বক্তৃতা করিলে কিরূপে ?” কেনারাম উত্তর দিতে যাইতেছিল ;—তুমি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলে “যাও।” তোমার পারিষদেরা জানে, তুমি কখন কখন তোমার দারুণ তেজস্বিতা সংযত রাখিতে না পারিয়া, অতিথি ফকীরকে চড়টা, চাপড়টা, দিয়া থাক,—কাজেই তাহারা বলিল, “আর কেন বাপু, অন্যত্র দেখ না কেন ? বাবুর সঙ্গে তর্ক বিতর্কে কাজ কি ?”

কেনারাম শ্রীমানের ভবন হইতে ছলছল নেত্রে ফিরিয়া, সুবিধা পাইয়াও আর দুই তিন বাড়ী প্রবেশ করিল না। কিন্তু উদরের জ্বালা বড় জ্বালা; আর এক বাড়ী প্রবেশ করিল। তাহারা বলিল, "এমন চাল শস্তায় এত ভিখারিও হইয়াছে—না বাপু, এখানে কিছু হইবে না।" আর একজনেরা বলিল—"বুধবারে আসিও"—কেনারামচলিয়াছে; চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "এখন দরওয়ান কোথা গিয়াছে।" পঞ্চম ব্যক্তি একমুষ্টি তণ্ডুল আনিয়া দিল। কেনারাম চক্ষের জল মাত্র দিয়া তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল। সেই তণ্ডুলগুলি চর্ব্বণ করিতে করিতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া জল পান করিল। চট্টোপাধ্যায়, আহ্নিক করিতেছিলেন;—কেনারাম গণ্ডুষ গণ্ডুষ জল খাইতেছে দেখিয়া জল হইতে উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কা'দের বাড়ী কাজ করিতেছ বাপু?" "মহাশয়, আজ কাজ করিতে পারি নাই—কাল হইতে খাওয়া হয় নাই" ব্রাহ্মণ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখিয়া কেনারাম আপনার দুঃখের কথা বলিল।

চট্টোপাধ্যায় কেনারামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রথমে চারিটি জলপান দিলেন, তাহার পর আপনার আহারের পর কেনারামকে প্রসাদ দিলেন। কেনারাম উদর পূরিয়া খাইল। মন ভরিয়া ব্রাহ্মণের মঙ্গল কামনা করিল।

কেনারামকে অন্নদান করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের যে আত্মপ্রসাদ হইল, নূতন সভ্যতার হিসাবী দানে তাহা পাওয়া যায় কি? আমরা বিবেচনা করি, সামাজিক দান, বা পবলিক চারিটি দ্বারা এ সুখ কখনই পাওয়া যায় না। যাহাতে সুখের নূতন নূতন পন্থা পাওয়া যায়, তাহারই নাম সভ্যতা— অতএব যাহাতে সুখের এরূপ একটি দ্বার রুদ্ধ হইতেছে, তাহা সভ্যতা বলিব কেন?

———

আপনার অবস্থা অগ্রে বুঝা আবশ্যক।

আপনার অবস্থা অন্ততঃ কতকটা বুঝিতে না পারিলে সেই অবস্থা ভাল করিবার চেষ্টা হয় না। আমরা আপনাদের অবস্থা কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, সুতরাং আমাদের যত্ন নাই বলিলেও চলে।—সে কি? এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছি, গায়ের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে, শরীর, অস্থিচর্ম্ম সার হইতেছে;—আর তুমি বল, আমাদের অবস্থা উন্নত করিতে আমাদের চেষ্টা নাই! তোমার ও ঘোর মিথ্যা কথা।

বাস্তবিক অনেকেই ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁরা কি আপন আপন অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন না? আমরা বলি, তাঁহারা হয় ত, মনে করিতেছেন, যে "আমরা আমাদের অবস্থা ক্রমেই ভাল করিব," কিন্তু তাঁহারা যে প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনাদের ইচ্ছা ফলবতী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে প্রকরণ পদ্ধতি বুদ্ধি-সঙ্গত নহে, সুতরাং সে চেষ্টাকে আমরা চেষ্টাই বলি না।

কোন ব্যক্তিকে যদি একটি চৌবাচ্ছায় জল পুরিতে বলা হয়; আর সেই ব্যক্তি যদি সেই চৌবাচ্ছার চারিদিকের জলনিঃসরণের পথগুলি ছিপি দিয়া না আটকাইয়া, ক্রমাগত কেবল জলই তুলিতে থাকে, আর চৌবাচ্ছায় ঢালিতে থাকে,— তাহা হইলে সেই ব্যক্তি গলদঘর্ম্ম হইয়াছে বা দিবারাত্রি খাটিতেছে বলিয়া যেমন তাহার চেষ্টা প্রকৃত বুদ্ধি সঙ্গত চেষ্টা বলি না, সেইরূপ স্কুলের ছাত্র হইতে, জেলার সদর আলা পর্য্যন্ত অনবরত গলদঘর্ম্ম হইয়া খাটিতেছেন বলিয়া, আমাদের মধ্যে অনেকেই যে আপন আপন অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বলি না। জল তুলিয়া মরিতেছি, বটে, কিন্তু অনবরত যে চারিদিক দিয়া জল বাহির হইতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু করিয়াছি কি?

চৌবাচ্ছায় জল পূরিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে চৌবাচ্ছার ঘাই গুলা বন্ধ করা চাই। যদি বন্ধ করিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে জল পূরিবার ভার লইব কেন? তাহার পর মনে করুন, নিকটে হউক দূরে হউক, জল থাকা চাই। শাহা-রার মধ্যে বা হিমালয় শৃঙ্গে জল বোঝাই করিতে

বলিলে পারিব কেন ? তাহার পর জল থাকিলেই হইবে না, টেক্‌সই কলসী পাওয়া চাই। এইরূপ দেখিবেন, অতি সামান্য কার্য্যেও সমস্ত অবস্থা বেশ পর্য্যালোচনা না করিয়া, কাজে লাগিলে, সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অথচ অতি গুরুতর কার্য্যও আমরা অবস্থা না বুঝিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। সুতরাং অনেক সময় আমাদের বিড়ম্বনা ভোগেই জীবনটা কাটিয়া যায়। পঠদ্দশার কথা ধরি না, কেন না বালক কালে আপনার অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। কিন্তু পাঠ সাঙ্গ করিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন কি একবার ভাবা উচিত নয়, যে আমি কি কার্য্য করিতেছি, আর তাহার উপকরণ উপাদানই বা আমার কি আছে ; আমাদের দেশের যুবকেরা এ সকল বিষয়ে প্রায়ই কখন কিছু ভাবেন না, সুতরাং অনেক সম জল তোলা হয়, কিন্তু চৌবাচ্ছা ভরে না। আম দের শেষ নিবেদন, আপনার অবস্থা বুঝিতে সকলে যেন সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করেন।

সমাপ্ত।